গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১৭ - ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

যুদ্ধাপরাধী জর্জ বুশের ভারতে আমন্ত্রণ বাতিল কর

যুদ্ধবাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভারত সফরের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৩০ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, সমগ্র বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যখন জর্জ বুশের ইরাক দখলের অপরাধের নিন্দায় মুখর ; ইরান, উত্তর কোরিয়া ও কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন হুমকি ও শাসানির প্রতিবাদে সরব ; সকলেই যখন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে ইরাক থেকে সকল মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করতে হবে; যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জর্জ বুশকে কাঠগড়ায় তোলার দাবি তুলেছে মানুষ — ঠিক সে সময় ভারতের মাটিতে জর্জ বুশকে আমন্ত্রণ জানানোর ঘটনা ভারতবাসীকে হতবাক করে দিয়েছে। তিনি বলেন, এই ঘটনা দেখাল যে, ভারতের শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী, যারা বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের জুনিয়ার পার্টনার রূপে মাথা তুলছে, তাদের স্বার্থরক্ষায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মেলানোর মত জঘন্য কাজেও কংগ্রেসের ইউ পি এ সরকার পিছপা নয়। তিনি আরও বলেন, সিপিএম, সিপিআই-এর ভূমিকাও দেশের বিবেকবান, স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষকে বিস্মিত করেছে। এই দুই দল ভাব দেখাচ্ছে, তারা বুশের ভারত সফরের প্রবল বিরোধী। এটাই যদি সত্য হয়, কংগ্রেস সরকার কর্তৃক বুশকে আমন্ত্রণ জানানোর কাজে যদি সিপিএম-সিপিআই'র প্রচ্ছন্ন সমর্থন না থাকে, তাহলে তাদেরই সমর্থনের উপর যে সরকারের অস্তিত্ব নির্ভরশীল সেই সরকার কী করে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে নিন্দিত জর্জ বুশকে আমন্ত্রণ জানাতে পারল?

কমরেড মুখার্জী সমগ্র দেশের জনগণকে, জর্জ বুশের নিন্দনীয় ভারত সফরের দৃঢ় বিরুদ্ধতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে বুশের প্রতি আমন্ত্রণ প্রত্যাহারে ভারত সরকারকে বাধ্য করা যায়।

সিপিএম ও সিপিআই নেতৃত্বকেও তাদের দ্বিচারিতা ও জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার নীতি পরিত্যাগ করার জন্য কমরেড মুখার্জী আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন, বুশের ভারত সফরের বিরোধিতায় যদি তারা যথার্থই আন্তরিক হয়, তবে তার প্রমাণ স্বরূপ এখনই চরমপত্র দিয়ে ইউ পি এ সরকারকে তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, সরকার অবিলম্বে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার না করলে, এই সরকারের প্রতি সিপিএম-সিপিআই সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে।

হংকং সম্মেলন আবার দেখাল

নয়া ঔপনিবেশিক শোষণেরই হাতিয়ার ডব্লিউ টি ও

ব্যবসা ও বিনিয়োগের বাজার ভাগাভাগি নিয়ে ডব্লু টি ও বা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলির মন্ত্রীস্তরের যে সম্মেলন গত ডিসেম্বর মাসে হংকংয়ে হয়ে গেল, তার ঘোষিত সিদ্ধান্তগুলোর অর্থ ও সম্ভাব্য ফলাফল কী, তা নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এখনও চলছে। এই ধরনের বৈঠকে বাণিজ্যের নিয়মকানুন স্থির করতে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, সিদ্ধান্তের ঘোষণাপত্রে বাক্য গঠনরীতির মধ্যেই এত অনুচ্চারিত অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকে, যার প্রায়োগিক অর্থ উদ্ধার করার কাজটা অনেকটা সাংকেতিক ভাষার রহস্য উদ্ধার করার মতো। যেমন, এতদিন ডব্লু টি ও'র মাধ্যমে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনাকে বলা হত 'মাল্‌টিল্যাটারাল' অর্থাৎ বহুমুখী। এবার হংকং বৈঠকে পরিষেবা ক্ষেত্রের বাজার খোলার আলোচনায় 'মাল্‌টিল্যাটারালে'র স্থানে 'প্লুরিল্যাটারাল দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে আসা হল। এই দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রায় একই, অথচ বাস্তবে এই শব্দ পরিবর্তনের দ্বারা এই ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেওয়া হল, যার জন্য পরিষেবা ব্যবসায়ী মালটিন্যাশনালগুলো ওত পেতে বসেছিল। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর যথারীতি তারা উল্লসিত। এর তাৎপর্য উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে ভয়াবহ। অতএব এই 'প্লুরিল্যাটারাল' শব্দটি ঠিক কী উদ্দেশ্যে আনা হল, তার অগ্রপশ্চাৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে, অর্থাৎ বাণিজ্য সংক্রান্ত ভাষা ও ব্যাকরণের সাথে পরিচিত না থাকলে এর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে পারা কঠিন।

আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে, বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার ব্যাকরণটা কেবলমাত্র অর্থনীতির বিষয় নয়, তার সাথে রাজনীতি জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। যেমন, হংকং সম্মেলনের শেষ দিন যখন চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে অনুমোদন দেওয়ার সময় এল, দেখা গেল, লাতিন আমেরিকার ছোট্ট দুটি দেশ কিউবা ও ভেনেজুয়েলা ছাড়া 'উন্নয়নশীল' বলে কথিতঅন্য কোন দেশ বিরুদ্ধতায় দাঁড়াল না। অন্য অনেকের তুলনায় আর্থিকভাবে দুর্বল হয়েও

চারের পাতায় দেখুন

দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের সামনে ডব্লু টি ও'র হংকং বৈঠকের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই, সি পি আই এম-এল, সিপিআই এম-এল-নিউ প্রোলেটারিয়ান এবং অল ইন্ডিয়া নেপালী লেফটিস্ট ইয়ুথ ফ্রন্টের যৌথ বিক্ষোভ

ডানলপ ঃ মালিকের পাশে সরকার, শ্রমিকের ঘাড়ে ছাঁটাইয়ের কোপ

দেশের প্রাচীনতম টায়ার উৎপাদনকারী কারখানা ডানলপ ঠিক ভোটের মুখে খুলতে যাচ্ছে। অন্তত এখনও পর্যন্ত সংবাদ সে'রকমই। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের মধ্যস্থতায় কারখানা খোলার পূর্বশর্ত হিসাবে সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন কারখানাটির নতুন মালিক আয়কর ফাঁকির আসামী পবন রুইয়া এবং সিটু ও আই এন টি ইউ সি — এই দুই শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

২০০১ সালে পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ডানলপের সাহাগঞ্জ ইউনিটটি ছিল এ'রাজ্যের প্রধান এবং প্রখ্যাত বড় কারখানাগুলির মধ্যে অন্যতম। শুধু যে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী এই কারখানাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই নয়, এঁদের আয়ের উপর নির্ভর করে সাহাগঞ্জের হাট-বাজার-দোকানপাট চলত, জীবিকার সংস্থান হত বহু সহস্র মানুষের।

কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই মানুষগুলি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা চূড়ান্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়ে যান। অনাহারের জ্বালা সইতে না পেরে বন্ধ ডানলপের কত কর্মীকে যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে, আর কতজন, কারখানা খোলার আশায় নিষ্ফল দিন গুনতে গুনতে শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে গেছেন — তার খবর সংবাদপত্রের পাতায় বহুবারই প্রকাশিত হয়েছে। এখনও দরজায় দরজায় ধূপ ফেরি করা বা ট্রেনের কামরায় লজেন্স বিক্রি করে বেড়ানো বন্ধ ডানলপের পুরানো বহু কর্মীর সঙ্গে নিত্যযাত্রীদের প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়।

এই পরিস্থিতিতে যখন নতুন করে আবার কারখানাটি খোলার কথা উঠল, তখন স্বাভাবিক কারণেই দুঃস্থ কর্মচারীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। কাগজে পত্রে নতুন মালিক পবন রুইয়াকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল যেন তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনও দেবদূত — বঞ্চিত, অনাহারী শ্রমিকদের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচাতে বন্ধ তালার চাবি হাতে কারখানা গেটের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। কাজ-হারানো শ্রমিকদের হাসিভরা মুখের ছবিও ছাপা হয়েছিল সেদিন; ছাপা হয়েছিল, ডানলপ খোলার

তিনের পাতায় দেখুন

উত্তর দিনাজপুর

ফ্রি স্টুডেন্টশিপ আদায় ইসলামপুর কলেজে

উত্তরদিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কলেজে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী এবং এস-সি, এস-টি-ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বেতন হাফ ফ্রি এবং ফুল ফ্রি করা নিয়ে নগ্ন দলবাজি চালাচ্ছিল ক্ষমতাসীন ছাত্রসংসদ। ফলে প্রকৃত দুঃস্থ অনেকেই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। কলেজের এ আই ডি এস ও ইউনিট গত ২০ জানুয়ারি অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দুঃস্থ সকলকেই এই সুযোগ দেওয়ার দাবি জানায়। অধ্যক্ষ বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। দলবাজি বন্ধের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়ায় এস এফ আই ক্ষিপ্ত হয়ে ডি এস ও সমর্থকদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। কুন্তল সাহা ও আজহার আলম সহ চারজন গুরুতর আহত হয়। এই আক্রমণের প্রতিবাদে এবং দুঃস্থ সকল ছাত্রছাত্রীকে প্রাপ্য হাফ ফ্রি ও ফুল ফ্রির সুযোগ দেওয়ার দাবিতে ২৮ জানুয়ারি ডি এস ও'র ডাকে কলেজে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। অবশেষে কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নেন। চারজন এস এফ আই দুষ্কৃতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

মুর্শিদাবাদ

জেলাশাসকের দপ্তরে কমসোমলের কিশোর-কিশোরীরা

মুর্শিদাবাদ জেলায় শিশু-কিশোর-কিশোরী পাচার রোধ, পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের দাবিতে এবং শিশুমৃত্যুরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্লক হাসপাতালগুলিতে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ, শিশু শ্রমিকদের উপযুক্ত পুনর্বাসন ও সমস্ত শিশুদের শিক্ষার আঙিনায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে ১ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই-র কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী 'কমসোমল' এর নেতৃত্বে শিশু কিশোররা একটি বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা শাসককে ডেপুটেশন দেয়। বহরমপুরে দলের অফিসের সামনে থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং টেক্সটাইল কলেজের সামনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমসোমলের প্রাক্তন নেতা কমরেড রফিকুল ইসলাম ও ডিএসও'র জেলা সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ মণ্ডল তাঁদের বক্তব্যে শিশু ও কিশোরদের সমস্যার ভয়াবহতা তুলে ধরেন। পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করেন এবং দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানায়। যে সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আর্সেনিক যুক্ত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে এমন কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামের তালিকাও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দল থেকে ফিরে এসে সভায় বক্তব্য রাখেন কমসোমলের জেলা সম্পাদক কমরেড ওহিরুজ্জামান। তিনি সমস্যার ভয়াবহতায় সরকার ও প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। প্রাথমিকে ইংরেজি প্রবর্তন ও বিদ্যুৎ আন্দোলনে জয়ের কথা উল্লেখ করে সাধারণ মানুষকে সমস্যা মোকাবিলায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন — একমাত্র গণআন্দোলনই শেষ কথা বলে।

ত্রিপুরায় নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১১০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারি এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে আগরতলা কামান চৌমুহনীতে নেতাজীর শৈশব থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের ৬০টি দুষ্প্রাপ্য ছবি ও উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণে কমরেড অরুণ ভৌমিক বলেন — দেশের শাসক ও শোষকশ্রেণী অত্যন্ত সুকৌশলে নেতাজীসহ স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের বর্তমান প্রজন্মের মন থেকে মুছে দিতে চাইছে। পাঠ্যপুস্তকে তাঁর জীবন সংগ্রামের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। তাই শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, নেতাজীর জীবন সংগ্রামকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যে দিয়ে তাঁর অপূরিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেদের তৈরি করতে তিনি সমস্ত ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানান। শহরের বিভিন্ন স্থানে জনতার মধ্যে নেতাজীর প্রতিকৃতি সংবলিত ব্যাজ পরানো হয়।

সর্বভারতীয় প্রতিবাদ সপ্তাহে মহিলাদের বিক্ষোভ

আসাম

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আহ্বানে নারীজীবনের বিভিন্ন সমস্যা প্রতিকারের দাবিতে ৪-১০ জানুয়ারি সর্বভারতীয় প্রতিবাদ সপ্তাহে ৬ জানুয়ারি আসামের গৌহাটিতে ১৩টি জেলা থেকে আগত সহস্রাধিক মহিলাদের এক মিছিল দীর্ঘ ১২ কিমি পথ অতিক্রম করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক নিরুপমা বরগোঁহাই, শিক্ষাবিদ রেণু দেবী, প্রীতি বরুয়া সহ সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড ইনা হুসেন এবং সভানেত্রী কমরেড চন্দ্রলেখা দাস বক্তব্য রাখেন। কোকরাঝাড় জেলার অল বোড়ো উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন রামেলা ইসলারী। মিছিলে হিন্দু, মুসলিম, অসমিয়া, বোড়ো, রাভা, কোচ, মিচিং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মহিলাদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় সঠিক আদর্শে গণআন্দোলনই জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য-সংহতি গড়ে তোলার ভিত্তি। ১০ জানুয়ারি মঙ্গলদৈ-এ অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষিকা তিলোত্তমা শইকিয়া ; বক্তব্য রাখেন স্বর্ণলতা চালিহা এবং চন্দ্রলেখা দাস।

ঝাড়খণ্ড

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন আহূত প্রতিবাদ সপ্তাহের প্রস্তুতিতে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে সভা-সমাবেশ, মিছিল, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি পালনের পর ২৫ জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ওইদিন একটি মহিলা মিছিল রাঁচি জেলা স্কুল থেকে বেরিয়ে নানা পথ পরিক্রমার পর মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে পৌঁছে জনসভায় পরিণত হয়। বিশ্বায়নের কুফল, বিশেষত নারীজীবনে তার বিপর্যয়কর পরিণাম এবং নারীর চরম নিরাপত্তাহীনতার দিকগুলি বক্তারা তুলে ধরেন। প্রচারমাধ্যমে অশ্লীলতা, ডাইনি প্রথা ও নারীপাচার বন্ধ করা, ছাত্রীদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা, নারীদের উপযুক্ত কাজ ও মজুরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবি সংবলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়।

উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে জি-প্লট জনস্বার্থ রক্ষা কমিটির ডেপুটেশন

জি-প্লট জনস্বার্থ রক্ষা কমিটির ডাকে গত ১ ফেব্রুয়ারি পাথরপ্রতিমা বিডিও অফিসে (রামগঙ্গায়) শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এক গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই অঞ্চলটি পাথরপ্রতিমা ব্লকের সর্বদক্ষিণে তথা রাজ্যেরও দক্ষিণতম বদ্বীপ। এখানকার প্রধান সমস্যা হল, সমুদ্র ও নদীর বাঁধ ভেঙে হাজার হাজার বিঘা জমি ও শত শত বাস্তুভিটা সমুদ্র গর্ভে চলে যাচ্ছে। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল নয়। মূল স্থলভাগের সাথে যোগাযোগ করতে ভুটভুটি করে কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। এখানকার মানুষের দানে একসময় ইন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হলেও ২০০৪ সালে রাজ্য সরকার তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে এক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় 'জি-প্লট জনস্বার্থ রক্ষা কমিটি'। উক্ত কমিটির উদ্যোগে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু রাখা, হাইস্কুলকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করা ও বাঁধ বাউন্ডারি যথাযথভাবে নির্মাণ করার দাবিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। বাঁধ বাউন্ডারি নির্মাণে সরকারি অবহেলা, কর্মচারী, ঠিকাদার ও স্থানীয় দালালচক্রের দ্বারা প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা কাগজে কলমে ব্যয় হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের কোন উপকার হয় না। এদেরই চক্রান্তে আজ বহু পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে রয়েছে। এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে ১ ফেব্রুয়ারি বিডিও অফিসে ডেপুটেশনে শতাধিক উদ্বাস্তু পরিবার অংশ নেয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন জি-প্লট জনস্বার্থ রক্ষা কমিটির সম্পাদক কার্তিক দাস, সদস্য কালিপদ দাস, হরেকৃষ্ণ দাস, নারায়ণ দাস এবং বাস্তুহারাদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্য মণ্ডল, প্রতাপ দাস, মতিলাল বারুই, সনৎ প্রধান, সুশান্ত জানা প্রমুখ। ডেপুটেশনে দাবি করা হয় (১) সরকারি অবহেলায় বাস্তুহারাদের উপযুক্ত পুনর্বাসন দিতে হবে; (২) যথোপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে, বাঁধ বাউন্ডারি নির্মাণ করতে হবে; (৩) পরিকল্পনা রূপায়ণে দুর্নীতি রুখতে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করতে হবে। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে বলেন, পুনর্বাসনের জন্য তিনি দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নেবেন, তবে দুর্নীতি কীভাবে রোখা যাবে তা তিনি বলতে পারছেন না। তাই জনগণকে সজাগ হয়ে তিনি দুর্নীতিগ্রস্তদের চক্রান্ত মোকাবিলা করার আবেদন রাখেন। শেষে ডেপুটেশনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন নারায়ণ দাস ও সম্পাদক কার্তিক দাস।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার বেনাগড়িয়া (তালা) গ্রামের এস ইউ সি আই দলের একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড রামচরণ মুর্মু ৬৮ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৬ ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৭০ এর দশকে তিনি দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। দল পরিচালিত স্থানীয়, জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিতেন এবং দলের কথা নিজের এলাকায় মানুষের কাছে নিয়ে যেতেন। কমরেড রামচরণ মুর্মু ছিলেন কৃষক ও দিনমজুর পরিবারের সন্তান। এস ইউ সি আই যে খেটে খাওয়া সর্বহারা মানুষের প্রকৃত দল, এবং একমাত্র এ দলই যে পারে গরিব মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি দলীয় পত্রিকা গণদাবী এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে পায়ে হেঁটে দিয়ে আসতেন। পার্টির পুস্তক পুস্তিকা হাতে পেলেই তিনি পড়ে ফেলতেন, গণদাবী খুঁটিয়ে পড়তেন এবং অপরকে পড়ানোর জন্য ব্যাকুল হতেন। পরিবারের সদস্যদেরও তিনি দলের সমর্থকে পরিণত করেছেন। গরিব মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অগাধ। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল তাঁর বাড়িতে যান এবং মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। ডি এস ও-র জেলা সভাপতি কমরেড কৃপাসিন্ধু কর্মকার, স্থানীয় কমরেড শিশির সিংহবাবু এবং কমরেড রাজেন মুখার্জীও তাঁর মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড রামচরণ মুর্মু লাল সেলাম

হরিয়ানার জিন্দ জেলার দুরয়ানপুরে স্কুলছাত্রীদের ধর্ষিত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনায় ধিক্কার জানিয়ে এ আই ডি এস ও ১১ ফেব্রুয়ারি দিল্লি, হরিয়ানা ও কলকাতায় বিক্ষোভ দেখায়। (ছবিতে) কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে বিক্ষোভ

ডানলপ ঃ মালিকের পাশে সরকার, শ্রমিকের ঘাড়ে ছাঁটাইয়ের কোপ

একের পাতার পর

খবরে তাদের আনন্দব্যাকুল প্রতিক্রিয়ার বিবরণ। কীভাবে তারা নতুন মালিক পবন রুইয়ার কাছে কারখানা চালু করার আকুল আবেদন জানাচ্ছে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি কীভাবে তাঁদের আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন — তার রিপোর্টও প্রকাশ করেছিল কাগজগুলি।

কিন্তু, শ্রমিকদের ত্রাতা হতে যে পবন রুইয়া আসেননি; শ্রমিক-কল্যাণ নয়, ডানলপ খোলার পিছনে যে কাজ করছে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে সর্বোচ্চ মুনাফা লোটার জন্য তাঁর উদগ্র লালসা — সে কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যখন মন্ত্রী নিরুপম সেনের ঘরে শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতৃত্বের সামনে তিনি সমঝোতাপত্রটি পেশ করলেন।

সমঝোতাপত্রে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ডানলপের সাহাগঞ্জ ইউনিট বন্ধ হওয়ার আগে সেখানে যে ২ হাজার ৭০০ জন শ্রমিক কাজ করতেন, নতুন করে কারখানা খুললে তাঁদের মধ্যে এক হাজার চারশো থেকে এক হাজার সাতশো জন ছাঁটাই হয়ে যাবেন। কারখানার কাজ চলবে এক হাজার, অথবা খুব বেশি হলে তেরশো কর্মীকে দিয়ে। যে সব কর্মীদের স্বেচ্ছাবসর দেওয়া হবে, ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁরা পাবেন মাথাপিছু সর্বোচ্চ মাত্র ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা — আজকের দিনে যার প্রকৃত মূল্য নেহাতই সামান্য। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পবন রুইয়ার হিসেব হল — স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য হওয়া শ্রমিক যত বছর চাকরি করেছেন এবং যত বছরের চাকরি তাঁর অবশিষ্ট আছে, তার মধ্যে যেটি কম হবে তার প্রতি বছরের জন্য তাঁকে ১২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে; তবে হিসাবে এই পাওনার পরিমাণ যাই হোক না কেন, ১ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি টাকা কোনমতেই কাউকে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের জন্য তিনি বরাদ্দ করেছেন মাথাপিছু মাসিক মাত্র এক হাজার টাকা, ১০ বছরের হিসাবে যা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। এর মানে হল, শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা রুইয়া মেটাবেন না; ভিক্ষার মতো করে সামান্য কিছু অর্থ ঠেকিয়ে দাক্ষিণ্য বর্ষণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, বন্ধ হয়ে যাবার পর ১৯৯৮ সালে একবার কারখানাটি কিছুদিনের জন্য খুলেছিল। সে'সময় যেসব কর্মীরা ডানলপে কাজ করেছিলেন, তাঁদের ১১ মাসের বেতন বকেয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এজন্য শ্রমিকের প্রাপ্য হয় মাথাপিছু ৭০ হাজার টাকার মতো (সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ৩১-১-০৬)। সমঝোতা বৈঠকে রুইয়া কথা দিয়েছেন, কর্মীদের বকেয়া বেতন তিনি মেটাবেন, কিন্তু সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছেন শ্রমিক পিছু ৩০ হাজার টাকা। এ টাকাও একবারে রুইয়া দেবেন না, মেটাবেন কিস্তিতে। অর্থাৎ শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য বেতনের একটা অংশও কর্মচারীরা কবে পাবেন, তা অনিশ্চিত।

একজন শিল্পপতি, শ্রমিকদের বঞ্চিত করে যথাসম্ভব মুনাফা লোটাই যাঁর পরম ধর্ম, তিনি কারখানা খোলার বদলে এই ধরনের শর্ত চাপালে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু যা বিস্ময়কর এবং ব্যথার, তা হল — দক্ষিণপন্থী আই এন টি ইউ সি সংগঠনের সঙ্গে সিটুর মতো একটি বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের নেতারাও এইসব শর্ত মেনে নিয়ে লুঠেরা মালিকের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, প্রথমে এই শর্তগুলি মানতে তাঁরা রাজী ছিলেন না, মন্ত্রী নিরুপম সেন তাঁদের বাধ্য করেছেন পবন রুইয়ার সমস্ত দাবি মুখ বুজে মেনে নিতে। হুমকি দিয়ে তিনি বলেছেন, রুইয়ার দেওয়া শর্ত মেনে না নিলে তিনি নিজে কারখানা গেটে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের বলবেন — ইউনিয়নের অসহযোগিতার কারণেই কারখানা খোলা যাচ্ছে না।

অভুক্ত, অসহায় শ্রমিক-কর্মচারীরা এই মুহূর্তে কারখানাটি খোলাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন। যেকোন মূল্যে এখন তাঁদের রুটি-রুজির আশ্বাস চাই। মালিকের চাপানো শর্তের ভাল-মন্দ বিচার করার মতো মানসিক অবস্থা তাঁদের এখন নেই। কারখানা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যে বহু সহকর্মীর ঘাড়ে ছাঁটাইয়ের খাঁড়া নেমে আসবে — এ'কথা তাঁরা জানে। সরকার ও বুর্জোয়া গণমাধ্যম তাদের বোঝাচ্ছে কারখানা চালু হলে কিছু লোক তো অন্তত কাজ ফিরে পাবে! তবে সেটুকুই হোক। কাজ-হারানো শ্রমিকদের এভাবে বিভ্রান্ত করার কৌশল ভালোভাবেই জানা আছে নেতা-মন্ত্রীদের। মালিকদের ধূর্ত কৌশল রপ্ত করা নিরুপমবাবুরা এখন গদিতে বসে নিজেদের দলের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সেই জঘন্য কৌশলটি প্রয়োগ করছেন।

ডানলপের সিটু নেতৃত্বের মধ্যে যে অংশটি এভাবে শ্রমিক ছাঁটাই মেনে নেওয়াকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে বিরুদ্ধতা করছিলেন, তাঁরা দলের নেতা ও মন্ত্রীর এই হুমকির সামনে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারেননি। বাইরে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু বিদ্রোহ যে করতে পারেননি, একথাও সত্য।

কেন এ নিরুপায় বাধ্যতা? আসলে যে সিপিআই(এম) দলের মতাদর্শ অনুসরণ করে এই শ্রমিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছে, প্রয়োজনে সেই দলেরই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করে পবন রুইয়াকে তাঁর অন্যায় শর্ত প্রত্যাহারে বাধ্য করতে হলে আদর্শের যে দৃঢ়তা থাকা দরকার, সেখানেই ঘাটতি রয়েছে। কারণ সিপিএম রাজনীতি সেই আদর্শ দিতে পারেনা। তাছাড়া ২৯ বছর ধরে ট্রেড ইউনিয়নকে সরকার নির্ভর করে ফেলার পর এখন আলাদা কিছু করতে হলে কঠিন লড়াই চাই — শুধু বাইরে নয়, নেতাদের নিজেদের মধ্যেও। সিটু নেতৃত্বের এই দুর্বলতা সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা অন্যদের চেয়ে ভাল জানেন। আর, কংগ্রেসের আই এন টি ইউ সি'র কাছ থেকে কোন সংগ্রামী ভূমিকা আশা করাই যায় না। ঠিক এজন্যই নিরুপমবাবু বৈঠকে ডেকেছিলেন তাঁদের দলের সিটু ও কংগ্রেসের আই এন টি ইউ সি-কে। ডানলপে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও তাদের ডাকেন নি। তিনি জানেন যে, এস ইউ সি আই-এর আদর্শে পরিচালিত ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্ব মহাকরণের বৈঠকে উপস্থিত থাকলে পবন রুইয়ার দেওয়া অন্যায় শর্তগুলি এত সহজে তাঁদের দিয়ে মানিয়ে নেওয়া যাবে না, হুমকিতে কাজ হবে না।

প্রশ্ন করা হলে নিরুপমবাবু বলেছেন, পবন রুইয়া শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শর্ত চাপালেও শুধুমাত্র কারখানা খোলার লক্ষ্যেই তিনি এসব মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ শ্রমিকদের ঘাড়ে যত কোপই পড়ুক না কেন, ভোটের মুখে যেকোন প্রকারে বন্ধ ডানলপ একবার খুলিয়ে দিতে হবে, এবারের নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে নিরুপমবাবুরা 'শিল্পায়নে'র বাগাড়ম্বরকে বেছে নিয়েছেন যে! ফলে হাজারে হাজারে শ্রমিক ছাঁটাই হোক, শ্রমিকরা বঞ্চিত হোক ন্যায্য পাওনা থেকে, নতুন করে কাজ ফিরে পাবার আশায় বুক বেঁধেছিল যারা, যাক্ আরো একবার তাদের বুক ভেঙে — প্রচারের ঢক্কানিনাদে সহজেই চাপা দিয়ে দেওয়া যাবে তাদের আর্তনাদ। ভোটের বিজ্ঞাপনে চালু হওয়া কারখানার তালিকায় জ্বলজ্বল করবে ডানলপের নাম। আর কী চাই!

পবন রুইয়া খোশমেজাজে মন্তব্য করেছেন — "সরকার যেভাবে দুই ইউনিয়নকে মুখোমুখি বসিয়ে সহযোগিতা করেছে তাতে আমি সন্তুষ্ট।" তাই নিরুপমবাবুরাও কৃতার্থ। মালিকদের আশীর্বাদই যে গদি টিকিয়ে রাখতে এখন তাঁদের একমাত্র মূলধন! এই অবস্থায় সিটুর সৎ কর্মী সমর্থকদের ভেবে দেখতে হবে, যে সিপিআই(এম) -এর মতাদর্শে সমাজবদলের স্বপ্ন নিয়ে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে একদিন তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, সেই দলটি আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। মার্কসবাদের নামাবলী জড়িয়ে মালিকশ্রেণীর পায়ে সর্বস্ব সমর্পণ করেছে যে দলের নেতৃত্ব, তাদের মতাদর্শে চলে শ্রমিকদের অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও করা যাবে কি? সাধারণ শ্রমিকরাও একথা নিশ্চয়ই বোঝেন যে, আশু স্বার্থপূরণের আশায় মালিকের অন্যায় দাবি একবার মেনে নিলে সেখানেই সেই আক্রমণ শেষ হয়ে যায় না; যত দিন যায় ততই তা প্রবল হতে থাকে। যেকোন মূল্যে কাজ ফিরে পাবার আশায় যে শ্রমিক-কর্মচারীরা আজ রুইয়ার চাপানো অন্যায় শর্তগুলি মেনে নিচ্ছেন, অদূর ভবিষ্যতে মালিকের আরো হাজারটা অন্যায় আবদার মেনে নেবার জন্য তাঁদের তৈরি থাকতে হবে। সেদিন লড়বেন বলে যদি মনে করেন, তবে তার প্রস্তুতি এখনই দরকার, যার মূল কথা হচ্ছে সঠিক নেতৃত্ব, সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এখন থেকেই আর একটা কঠিন লড়াই শুরু করা।

কে কে এম এসের পাথরপ্রতিমা ব্লক সম্মেলন

গত ২১-২২ জানুয়ারি কে কে এম এসের পাথরপ্রতিমা ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দিগম্বর অঞ্চলের দুর্গাপুর গ্রামে। সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন করেন পাথরপ্রতিমার প্রাক্তন এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড রবীন মণ্ডল। ১৯৭৬ সালে অত্যাচারী জমিদারের গুণ্ডাবাহিনীর গুলিতে নিহত বিশিষ্ট নেতা কমরেড শান্তিরাম সরদারের শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন কে কে এম এসের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি কমরেড সনাতন দাস, সম্পাদক কমরেড রেণুপদ হালদার, এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ভাস্কর গুপ্ত এবং দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য কমরেড মাদার নস্কর ও কমরেড ফণিভূষণ গুছাইত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়া মাল্যদান করেন শহীদ কমরেড শান্তিরাম সরদারের স্ত্রী কমরেড কালিদাসী সরদার ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ। কংগ্রেসী শাসনে জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরিব কৃষক খেতমজুরদের সাহসী লড়াইয়ের উল্লেখ করে বক্তারা বর্তমানে বামফ্রন্টের হাত ধরে কৃষকসহ সমস্ত জনজীবনে দেশিবিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর যে শোষণ তীব্র রূপ নিচ্ছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান। ২২ জানুয়ারি প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয় কমরেড সুন্দর-চিত্ত-সুরেন-রবিরাম-রণজিৎ এর স্মরণে উৎসর্গিত মঞ্চে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কৃষিনীতি বাতিল, শুখা মরশুমে স্থায়ী নদীবাঁধ নির্মাণ, পঞ্চায়েতী ট্যাক্স বাতিল, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজের দাবিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়। কমরেড ললিত সাঁতরাকে সভাপতি ও কমরেড বিকাশ কান্তি পাত্রকে সম্পাদক করে ১৫ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

ডি এস ও-র ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

এ আই ডি এস ও আসাম রাজ্য কমিটির ডাকে সংগঠনের ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গভীর উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তা পালিত হয়েছে।

কাছাড়

গত ২ জানুয়ারি কাছাড় জেলা কমিটির ডাকে শিলচর গান্ধীভবনে এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সভাপতি ছিলেন কমরেড ভবতোষ চক্রবর্তী। প্রধান বক্তা সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতি প্রতিরোধে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

গোয়ালপাড়া

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৪ জানুয়ারি গোয়ালপাড়া জেলার চুনারিতে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার ছাত্র এবং শিক্ষাপ্রেমী মানুষ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড দিলওয়ারা হোসেন। এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চন্দ্রলেখা দাস বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি মুমূর্ষু পুঁজিবাদের স্বার্থে শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের নীতি গ্রহণের দ্বারা সাধারণ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের থেকে শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। রাজ্যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে কংগ্রেস সরকারের নেতিবাচক ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে তিনি আই এম ডি টি অ্যাক্ট পুনরায় চালু করার আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদেরও সামিল হওয়ার আবেদন জানান। সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান বলেন, সংকটগ্রস্ত পুঁজিপতি শ্রেণী আজ শিক্ষাকেও মুনাফার পণ্যে পরিণত করেছে। ফলে সর্বজনীন শিক্ষার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত। শিক্ষাকে মুনাফাবাজদের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবে ডি এস ও'র উপর বর্তেছে। এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানান।

এবারের কলকাতা বইমেলায় গণদাবী'র স্টল

হংকং সম্মেলন

পুঁজির জোরই নিয়ামক, ঐক্যমত্যের কথা ভড়ং মাত্র

একের পাতার পর

ভেনেজুয়েলা ও কিউবা যা পারল ভারত ও অন্যরা তা পারল না কেন? ওই দুটি দেশ একথাও জানত যে, তাদের বিরুদ্ধতায় সিদ্ধান্ত আটকাবে না। তবুও তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং বিরুদ্ধতা রেকর্ড করিয়েছে, যেটা ভারত করল না। 'জাতীয় স্বার্থ রক্ষার' বুলি আউড়ে ভারতের মন্ত্রী কমলনাথ তার সরকারকে দেশপ্রেমিক সাজাতে চেয়েছেন। 'জাতীয় স্বার্থ' কি ভেনেজুয়েলা ও কিউবার নেই? আসলে 'জাতীয় স্বার্থ' বলতে কার কাছে কাদের স্বার্থ বোঝায়, দেশপ্রেম মানে কার কাছে দেশের কোন্ শ্রেণীর প্রতি প্রেম — সেটা শাসকদলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

এই ঘটনা থেকে আমরা ডব্লু টি ও'র সদস্য দেশগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্ববিরোধের একটা ঝলকও পেলাম। ১৯৯৪ সালে মারাকেশ চুক্তির মধ্য দিয়ে ডব্লু টি ও গঠিত হওয়ার সময়, ভারতের কংগ্রেস নেতাদের মতো বিশ্বের সব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের বুর্জোয়া দল ও একচেটিয়া পুঁজির মুখপাত্ররা বলেছিল, মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ডব্লু টি ও'র লক্ষ্য। একথাও বলা হয়েছিল যে, এই সংস্থার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা ''সকল দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক'' একটি আদর্শ বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে; ''দ্বন্দ্ববিরোধহীন'' এই ''অবাধ বাণিজ্য'' ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশে দেশে মানুষের দারিদ্র ঘুচবে, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা কেটে যাবে, সুখ-সমৃদ্ধি আসবে। বুর্জোয়া রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আমাদের মতো যারা শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনীতি-রাজনীতিকে বিচার করার চেষ্টা করি, তারা কিন্তু বলেছিল, ''মুক্ত বাণিজ্য''-এর ধারণাই অলীক, তার মধ্য দিয়ে সকল দেশের সুখ-সমৃদ্ধির কথাগুলো নেহাতই গল্প — মিথ্যা ও ছলনাই যার ভিত্তি। কারণ, বিশ্ব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় 'মুক্ত' ও 'অবাধ' বাজারের নামে যারা যত বাণীই বিলোক, শেষপর্যন্ত মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা তাদের পক্ষেই যায় যাদের পুঁজির জোর বেশি। একটা পুঁজিবাদী দেশের ভিতরে এই খোলা বাজার দেশিয় একচেটিয়া পুঁজিকেই আরও সুবিধা দেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে দেশের একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠী বেশি শক্তিশালী, তারা অপরাপর দেশের বাজার আরও লুঠ করার সুযোগ পায়, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর স্বার্থই সিদ্ধ হয়। কখনও কোথাও যদি কোনও নিয়মকানুনের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয় তবে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদীরা সেই নিয়মকানুন মানে না, লঙ্ঘন করে যায়, অন্য পথ নেয়। যেমন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করেছিল যে, রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বশান্তির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে, এই প্রচারে অনেকে বিভ্রান্তও হয়েছিলেন। অথচ, ইরাক প্রশ্নে যখন রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মতবিরোধ দেখা দিল, ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসনে অন্য দেশের সায় পেল না আমেরিকা ও ব্রিটেন, তৎক্ষণাৎ বুশ ও ব্লেয়াররা রাষ্ট্রসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ইরাকে আক্রমণ চালাতে সামান্যও দ্বিধা করেনি।

এখন যে বাজার নিয়ে এত কাড়াকাড়ি সেই বাজার যদি অঢেল হত, অর্থাৎ যদি এমন হত যে, দেশে দেশে ব্যাপক জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়ছেই, তাহলে বাজার নিয়ে দ্বন্দ্বের তীব্রতা কমতে পারত। কিন্তু বাস্তবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে বিশ্বের সর্বত্র পুঁজিবাদী বাজারের ক্রমিক সঙ্কোচনই ঘটছে। রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষাই বলেছে, ৯০ দশক থেকে আজ পর্যন্ত ''মুক্তবাজার অর্থনীতির'' বিশ্বব্যবস্থায় ''উন্নয়নশীল'' দেশগুলিতে দারিদ্র, বেকারি ও অনাহার বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কমেছে। এমনকী পশ্চিমের শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে তথা খোদ আমেরিকায় গরিবি বেড়েছে। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তির দরুণ শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তির বিপুল বৃদ্ধি, অন্যদিকে সেই উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা জনগণের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্কোচন, অর্থাৎ বাজার সঙ্কোচন — এই দ্বন্দ্বের নিরসন ব্যক্তিমালিকানাধীন ও মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা করতে পারে না। যত বাজার সঙ্কুচিত হয়, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিরোধ তত বৃদ্ধি পায়। এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা প্রথম প্রকাশ পায় বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। নানারকম শুল্ক বসিয়ে, নানারকম শুল্ক বহির্ভূত বাধা তৈরি করে এক দেশ অপর দেশের রপ্তানি আটকাবার ও নিজেরটা বাড়াবার চেষ্টা করে। এই বাণিজ্য যুদ্ধই বাড়তে বাড়তে একসময় বাজার দখলের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়ে যায়, যেটাকেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলা হয়।

গ্যাট-এর উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনা যখন শুরু হয়, তখন বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ চলছিল। উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনাতেই শক্তিমান শাসকরা নিজেদের বাণিজ্যবিরোধের আপস-মীমাংসার ফর্মূলা হিসাবে ''মুক্ত বাণিজ্যের'' নিয়মকানুন তৈরি করে তার প্রয়োগ কর্তা ডব্লু টি ও'র জন্ম দেয়। এই মুক্ত বাজারের মূল কথা হল — সকল পুঁজিবাদী দেশের বাজারের সংযোজনের মধ্য দিয়ে একটি বিশ্ব বাজার তৈরি করা। অর্থাৎ কোনও দেশই তার জাতীয় অর্থনীতি ও বাজারকে সংরক্ষিত রাখবে না, অন্য দেশের পণ্য ও পুঁজির অবাধ ব্যবসার জন্য খুলে দেবে। একেই বলা হল বিশ্বায়ন এবং সকল দেশের উন্নয়নের ম্যাজিক পথ। যে বাজার সঙ্কট ও বাণিজ্য যুদ্ধ থেকে বেরোবার উপায় হিসাবে ডব্লু টি ও'র জন্ম দেওয়া হল, সেটা মনে রাখলে, একথা বোঝা দুঃসাধ্য নয় যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার যেসব পুঁজিবাদী দেশ (যারা একসময়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশ ছিল) নিজেদের জাতীয় বাজার সংরক্ষিত রেখে জাতীয় পুঁজিবাদের স্বনির্ভর বিকাশের 'মডেল' নিয়ে কম-বেশি চলছিল, তাদের বাজারে ঢোকা ও 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' সেই বাজার দখল করাই ছিল বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য। বনেদী সাম্রাজ্যবাদীরা ধরে নিয়েছিল এভাবে নিজেদের বাজার বাড়িয়ে তাদের বাণিজ্য যুদ্ধের নিরসন ঘটাতে পারবে। এই অর্থে 'বিশ্বায়ন' ও 'অবাধ বাণিজ্য' বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুঠের পরিকল্পনা এবং ডব্লু টি ও তা রূপায়ণের হাতিয়ার ছাড়া কিছু নয়। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলোর বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া শাসক দলগুলো এই পরিকল্পনার শরিক হয়েছে চাপে ও লোভে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে এইসব পুঁজিবাদী দেশগুলোর অনেকেরই সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক চাপ ঠেকানোর মত ক্ষমতা নেই। পাশাপাশি, ''অবাধ বাণিজ্য-ব্যবসায়ের'' ''কড়া নিয়মকানুন'' দেখেশুনে এর মধ্য দিয়ে নিজ নিজ দেশের পণ্য বিশ্ববাজারে বিক্রি করে সুযোগ পাওয়ার লোভও কাজ করেছে। আবার বহু দেশের মন্ত্রী ও আমলাদের ডলারের টোপ ও ঘুষ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা বাগে এনে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

উন্নয়নের এই প্রহসন গত ১০ বছরে অনেকটাই উন্মোচিত হয়েছে। প্রমাণ হয়েছে, মুক্ত বাণিজ্যের 'ম্যাজিক পথের' গুণকীর্তন করে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য দেশের বাজার খোলাচ্ছে, কিন্তু নিজেরা খুলছে না; দ্বিতীয়ত, প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের ব্যাপক জনগণের জীবনে উন্নয়ন একটা মরীচিকা থেকে যাচ্ছে; ফলে গণবিক্ষোভ বাড়ছে, বুর্জোয়া শাসক দলগুলো বিপন্ন বোধ করছে। তাই এবার দোহা রাউন্ডের হংকং বৈঠকের আগে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশের শাসকরা ঠিক করেছিল, একজোট হয়ে আমেরিকা-ইউরোপ-জাপানের চাপ ঠেকাবে, তাদের মতো দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য বাণিজ্য নীতি তৈরির জোরালো দাবি করবে। এদের সাথে ভারতও শরিক ছিল।

১৯৯৪ সালে ''বিশ্ব মুক্ত বাণিজ্যের'' সাধারণ নিয়মনীতি নির্ধারিত হওয়ার পর স্থির করা হয়, বাণিজ্যের এক একটি ক্ষেত্র ধরে ধরে সদস্য দেশগুলির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান বিচারে নিয়ে এর প্রয়োগগত খুঁটিনাটি ঠিক করার জন্য দফায় দফায় সদস্য দেশগুলি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক করবে। এবং সিদ্ধান্ত হবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। পুঁজির জোরই যে ব্যবস্থায় প্রকৃত নিয়ামক, সেখানে এইসব আপাত গণতান্ত্রিকতা নিছক ভড়ং মাত্র।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে সিঙ্গাপুরে, ১৯৯৮ সালে জেনিভায়, ১৯৯৯ সালে সিয়াটলে, ২০০১ সালে দোহায় ও ২০০৩ সালে কানকুনে ৫টি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে হংকয়ে ষষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে দোহায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে যেসব বিষয়ে বাজার খোলার আলোচনা শুরু হয়েছিল ৪ বছরে তার মীমাংসা হয়নি বলেই এই পর্যায় ''দোহা রাউন্ড'' হিসাবেই অভিহিত হয়ে এসেছে। এই রাউন্ডে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষি। অর্থাৎ ''কৃষিপণ্যের রপ্তানি-আমদানি অবাধ করার পথে বাধাগুলি দূর করা।'' এই প্রশ্নেই 'উন্নয়নশীল' দেশগুলো বলেছিল, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো তাদের কৃষি রপ্তানিতে বিপুল অঙ্কের ভর্তুকি দেওয়ার ফলে এত কম দামে তা পাওয়া যায়, যার সাথে উন্নয়নশীল দেশের কৃষিপণ্য প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। অবাধ বাণিজ্য চাইলে ঐ ভর্তুকি তুলতে হবে। একই অভিযোগ জাপানের বিরুদ্ধেও।

তুলা ব্যবসা নিয়ে আফ্রিকার দেশগুলোর আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ — মার্কিন সরকার নিজ দেশের তুলা উৎপাদনকারী বিশাল বিশাল ফার্মগুলিকে বিপুল পরিমাণে ভর্তুকি দেয়, যার ফলে তারা অত্যন্ত কম দামে তুলা বেচতে পারে, যার সাথে দামের প্রতিযোগিতায় আফ্রিকার তুলাচাষীরা হেরে যাচ্ছে, তাদের তুলা রপ্তানি মার খাচ্ছে। অতএব, মুক্তবাণিজ্য চাইলে তুলায় দেওয়া বিপুল ভর্তুকি মার্কিন সরকারকে বন্ধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় যে বিপুল কৃষি ভর্তুকি দেওয়া হয়, সেটা ওদেশের গরিব চাষীরা পায় না, ধনকুবের কৃষি পুঁজিপতিরাই পায়। আবার ওরাই ভারতে এসে, সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য খাদ্যশস্য, কেরোসিন, ডিজেল-পেট্রল-গ্যাস ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ভর্তুকি তোলার জন্য দাবি করে, চাপ দেয়, এবং ওদের সপক্ষে ওকালতি করে এদেশের একদল দালাল 'বিশেষজ্ঞ'।

দোহা রাউন্ডে কৃষিপণ্যে ভর্তুকি তোলার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার উপর 'উন্নয়নশীল' দেশগুলির তরফ থেকে জোরালো চাপ আসবে জেনেই, কৃষিপণ্যের পাশাপাশি পরিষেবাক্ষেত্রের ও এমনকী শিল্পপণ্যের বাজার খোলার (নন এগ্রিকালচারাল মার্কেট অ্যাকসেস) আলোচনাও এই বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে যোগ করে দেওয়া হয় প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মাল্টিন্যাশনালদের স্বার্থে। ডব্লু টি ও'র কর্মকর্তার পদে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোরই স্বার্থ দেখার লোক, তাদের সাহায্য সাম্রাজ্যবাদীরাই পায়। এ ব্যাপারে যেসব ফর্মূলা ইউরোপ-আমেরিকার প্রতিনিধিরা আমদানি করেছে, আগের বৈঠকগুলোতেও বিশেষত জেনিভা বৈঠকে তা নিয়ে বিরোধ হয়েছিল। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির আপত্তি অগ্রাহ্য করেই সেগুলো হংকং বৈঠকে চূড়ান্ত মীমাংসার নামে সুপারিশ হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। একথা বলা হয়েছিল যে, হংকং বৈঠকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু হংকং বৈঠকের সিদ্ধান্তে দেখা গেল, বরাবরের মতো এবারও সকল ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিই তাদের স্বার্থ হাসিল করে নিয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ দেখার বদলে, ওইসব দেশের জনগণের স্বার্থ বলি দেওয়ার পাকা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষার নামে ভারতের ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদীদেরই সাহায্য করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৃষিপণ্যে ভর্তুকি বন্ধ করতে রাজি হয়েছে এবং সেই অর্থে উন্নয়নশীল দেশগুলির দাবি গৃহীত হয়েছে বলে যেকথা মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পেয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভাঁওতা। প্রথমত, ইউরোপ এখনই এটা কার্যকর করবে না, আরও দীর্ঘ ৭ বছর সময় নিয়ে ২০১৩ সালে করবে। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলি আগেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল, তারা ধাপে ধাপে রপ্তানি ভর্তুকি কমাতে থাকবে। তৃতীয়ত, রপ্তানি ভর্তুকি ছাড়া, আভ্যন্তরীণ বাজারে এরা কৃষিপণ্যে যে পরিমাণ ভর্তুকি দেয় সেটা

ছয়ের পাতায় দেখুন

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

কোচবিহার শহরে পার্টির বিশিষ্ট কর্মী কমরেড রমেশ দাস গত ২৯ জানুয়ারি ৫৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। পেশায় কাঠমিস্ত্রি রমেশ দাস ১৯৭৯ সালে দলের সংস্পর্শে আসেন। তারপর থেকে পারিবারিক জীবনে দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও তিনি সবসময়ই নিষ্ঠার সাথে দলের কাজ করে গেছেন এবং পরিবারের সদস্যদের দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

দলের জেলা কার্যালয়ে প্রয়াত রমেশ দাসের মরদেহ নিয়ে আসা হলে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কোচবিহার জেলা পার্টির পক্ষে কমরেড কাজল চক্রবর্তী, কোচবিহার শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড নেপাল মিত্র এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কমরেড রমেশ দাস লাল সেলাম।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই দলের কলকাতা জেলার আবেদনকারী সদস্য কমরেড আশা দে দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৭ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রথম জীবনে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত কমরেড আশা দে জীবনসায়াহ্নে যেদিন বুঝতে পারেন ওই দলের রাজনীতি ভ্রান্ত এবং এস ইউ সি আই সঠিক মার্কসবাদী দল, সেদিন থেকেই সত্যনিষ্ঠার প্রেরণায় তিনি এস ইউ সি আই-এর সঙ্গে যুক্ত হন ও মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী হিসাবে নারী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি এ আই এম এস এস-এর দমদম আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ছিলেন।

১০ ফেব্রুয়ারি দলের দমদম আঞ্চলিক অফিসে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড আশা দে লাল সেলাম।

স্মরণ করুন সত্যেন্দ্র দুবেকে

বিজেপি নেতৃত্বাধীন পূর্বতন এন ডি এ সরকারের আমলে ৫৪ হাজার কোটি টাকার সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কারণে মাফিয়াদের রোষের বলি হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির এক সৎ ও নির্ভীক অফিসার সত্যেন্দ্র দুবেকে। ঐ প্রকল্পের নতুন একটি সেতু, অতি সম্প্রতি, চালু হওয়ার দেড় মাসের মধ্যেই ভেঙে পড়ার ঘটনায় মনে পড়ে যায় সেই সত্যেন্দ্র দুবেকে। হাওড়ার বালির উত্তর জয়পুর বিলে নতুন তৈরি হওয়া এই সেতুটি ৯ ফেব্রুয়ারি ভেঙে পড়েছে। গভীর রাতের দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানি হয়নি। দিনের বেলায় এ ঘটনা ঘটলে কত মানুষের মৃত্যু হতে পারত সে কথা ভেবে শিউরে উঠছেন এলাকার মানুষ।

এন ডি এ আমলে দিল্লি-মুম্বই-কলকাতা-চেন্নাই — এই চারটি মহানগরকে যুক্ত করে গুজরাট থেকে অসম ও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়ে সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। তাতে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির ম্যানেজার হিসাবে বিহারের গয়ায় কর্মরত ছিলেন কানপুর আই আই টি র ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্র দুবে। কাজ করতে গিয়ে সত্যেন্দ্র টের পান, কী ভয়ানকভাবে নয়ছয় হয়ে যাচ্ছে মানুষের কাছ থেকে আদায় করা কোটি কোটি টাকা। সড়ক তৈরির ক্ষেত্রে কীভাবে নিম্নমানের কাজ করানো হচ্ছে; রাস্তার নক্সা তৈরি থেকে শুরু করে মালপত্র কেনার কাজে পর্যন্ত কী ধরনের দুর্নীতি চলছে ; বড় ঠিকাদার, সাব-কন্ট্রাক্টর সহ ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে কীভাবে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, কাজ করতে গিয়ে এ'সব কিছুই তাঁর নজরে আসে।

সব জেনেশুনেও চুপ থাকতে পারেননি এই সৎ ও দৃঢ়চেতা মানুষটি। সরাসরি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ির কাছে চিঠি পাঠিয়ে সমস্ত বিবরণ পেশ করেছিলেন। দুর্নীতিচক্রের পাণ্ডা মাফিয়াদের কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেওয়ায় তাঁর ওপরে যেকোন ধরনের আক্রমণ নেমে আসতে পারে — এই আশঙ্কায় তিনি নিজের নামটি গোপন রাখার অনুরোধও জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত হয়নি। শুধু তাই নয়, মাফিয়াদের অনবরত ভীতিপ্রদর্শনের মুখে দাঁড়িয়ে সরকারের কাছে তাঁর একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর নিরাপত্তারও বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। না বিহার রাজ্য সরকার, না কেন্দ্রীয় সরকার — কোথাওই তাঁর অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিকে লেখা এক চিঠিতে সত্যেন্দ্র দুবে লিখেছিলেন — ''আমি এই সংস্থা এবং প্রকল্পে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে চেয়ে দুঃখিত এবং আহত হয়েছি।'' এরপর একদিন মাফিয়ারা গয়া স্টেশনে গুলি করে সত্যেন্দ্র দুবেকে শেষ করে দেয়।

দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য সত্য প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছিলেন যে ন্যায়পরায়ণ মানুষটি, সরকারের ক্ষমাহীন গাফিলতিতে এইভাবে অকালে শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁর মূল্যবান প্রাণ। অথচ এরপরেও সরকারের পক্ষ থেকে সড়ক দুর্নীতি বন্ধ করা দূরের কথা, তা নিয়ন্ত্রণ করারও বিন্দুমাত্র চেষ্টা হল না। সে চেষ্টা হলে বিপুল অর্থব্যয়ে মুম্বই রোড সম্প্রসারণের জন্য নির্মিত নতুন সেতুটির এই জঘন্য পরিণতি হত না।

সরকার ও প্রশাসনের ওপরমহলের চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত কর্তাদের সঙ্গে গুণ্ডা-মাফিয়াদের যোগসাজসে এইভাবেই লুঠ হয়ে যাচ্ছে জনসাধারণের রক্তমোক্ষণ করে তোলা সরকারি কোষাগারের কোটি কোটি টাকা। নিচুতলার কর্মীরা বহু সময়েই এর প্রতিবাদ করেন। হাওড়ার এই সেতুটি ভেঙে যাওয়ার পরে কাজে নিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা বলেছেন, সেতু তৈরির কাজে যে নানারকম ত্রুটি থেকে যাচ্ছে — সে কথা বহুদিন ধরেই কর্তৃপক্ষকে তাঁরা জানিয়ে আসা সত্ত্বেও কর্তারা কান দেননি। অবাধে চলেছে দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্মাণ কাজ। জানা গেল, জয়পুর বিলের রাস্তাই প্রথম নয়, মাস চারপাঁচেক আগে বিপত্তি দেখা গিয়েছিল কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ইন্টারচেঞ্জে। আরও যেটা জানার মতো, তা হচ্ছে, এই সেতুর নির্মাণকারী সংস্থাটি মালয়েশীয়। বিদেশি প্রযুক্তি, বিদেশি পুঁজি, বিদেশি বিনিয়োগে 'দেশের উন্নয়ন' নিয়ে এত যে প্রচার — তারও একটি নমুনা পাওয়া গেল এই ঘটনায়।

মানবতাবাদী যোদ্ধা
ভি আর কৃষ্ণ আয়ারকে সংবর্ধনা

বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মহিলাদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সামনের সারির একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি ৯১ বছরে পদার্পণ করেছেন। বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে তাঁর মহতী ভূমিকাকে সম্মান জানাতে বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে গত ১ ফেব্রুয়ারি কেরালার এরনাকুলামে তাঁর বাসভবনে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শতাধিক সংগ্রামী মানুষের উপস্থিতিতে বিচারপতি আয়ার অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে এই সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। আগত সংগ্রামী মানুষদের উষ্ণ ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ সংবর্ধনায় তিনি অভিভূত হন। গভীর বেদনার সাথে শ্রীআয়ার বলেন, বিশ্ব আজ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা বাড়ছেই। আমাদের দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী ও ধনীরা এবং মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা — যাদের সঙ্গে আমাদের শাসকরা হাত মিলিয়েছে — যে শোষণ-লুট চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করাই হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা। এই বয়সেও গভীর প্রত্যয়ে তিনি বলেন, আমাদের লড়তেই হবে এবং ভবিষ্যৎ আমাদেরই।

বিচারপতি আয়ারের হাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের পক্ষে কমরেড মানিক মুখার্জী, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষে কমরেড কে উমা, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী, এ আই ডি এস ও-র পক্ষে কমরেড এম এন শ্রীরাম, এ আই ডি ওয়াই ও-র পক্ষে কমরেড টি কে সুধীরকুমার, কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটসের পক্ষে কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ। এছাড়াও এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, এস ইউ সি আই কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, দলের তামিলনাড়ু রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড ভি পি নন্দকুমার, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড সি এইচ মুরাহরি এবং কেরল রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোসও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতির পক্ষে মুল্লাকারা এবং ইউ টি ইউ সি-এল এসের পক্ষে এ জালালুদ্দিন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

সভার শুরুতে কমরেড ভি ভেনুগোপাল বিচারপতি আয়ারের উদ্দেশে লেখা 'মহান মানবতাবাদী যোদ্ধা' শীর্ষক শ্রদ্ধার্ঘ পাঠ করে শোনান — যা এই সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর আবেগের সৃষ্টি করে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভি আর কৃষ্ণ আয়ার। পাশে রয়েছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী (বামদিকে) ও কমরেড মানিক মুখার্জী (ডানদিকে)

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ জয়

ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা মোকাবিলার সঠিক পথে না-গিয়ে সরকার চালু করেছিল স্বনিযুক্তি বা স্বনির্ভর প্রকল্পের মত কিছু প্রতারণার প্রকল্প। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করেছিল। বিনিময়ে সরকার তাদের চাকরি পাওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড বাতিল করে দিয়ে। তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে এই স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে সেই ঋণের টাকা সময়মতো পরিশোধ করা, যা বাস্তবে সম্ভব নয়, তা করতে না পারার অপরাধে সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে ঋণগ্রহীতাদের উপর নামিয়ে আনে ব্যাপক অত্যাচার। শুরু হয় পুলিশি ও প্রশাসনিক হয়রানি। মামলা করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। শিক্ষিত বেকার যুবকদের বিনা বিচারে দিনের পর দিন জেলে আটক করে রাখা হয়। প্রতিবাদে গড়ে ওঠে ঋণগ্রহীতাদের সংগঠন 'সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতি'। স্বনিযুক্তির ভাঁওতার বিরুদ্ধে এই সংগঠন লাগাতারভাবে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা ব্লকের একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। সূতি ব্লকে কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রতিবাদে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে যুবকরা ৪৮ ঘণ্টা অনশন আন্দোলন করে। সরকার চাপে পড়ে ধৃত যুবকদের নিঃশর্তে মুক্তি দেয়। বর্তমানে সুদ বাদে আসল টাকার একটা অংশ নিয়েই ব্যাঙ্কগুলি আপস মীমাংসা করার কথা বলছে। আন্দোলনের এটা উল্লেখযোগ্য জয় হলেও সরকার আজও স্বনিযুক্তি প্রকল্প বা স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ করেনি। গত ১ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় তিন শতাধিক যুবক-যুবতী স্বনিযুক্তির ভাঁওতার প্রতিবাদে এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবিতে বহরমপুর শহরে সুসজ্জিত মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। জেলাশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করে বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস, জেলা সম্পাদক এমদাদুল হক, মোসাব্বর হোসেন, নজরুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। জেলাশাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সমাধানের আশ্বাস দেন।

টালিগঞ্জে মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সম্প্রতি টালিগঞ্জের সূর্য নগরে শহীদ মাস্টারদা সূর্য সেনের আবক্ষ মূর্তির পাশেই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বোর্ড লাগিয়ে একটি মদের দোকান চালু হয়। এলাকায় সাধারণ মানুষ দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার খবর পেয়েই প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। স্থানীয় কাউন্সিলার সহ আরও উচ্চতর আধিকারিকদের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়, অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক সভাও। কিন্তু সব প্রতিবাদ উপেক্ষা করে পুলিশের সাহায্য নিয়ে মালিক মদের দোকানটি চালু করে দেয়।

অবিলম্বে মদের দোকান বন্ধের দাবিতে ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এমএসএস-এর নেতৃত্বে ৮ ফেব্রুয়ারি দোকানের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ ও লাগাতার পিকেটিং শুরু হয়। দোকান বন্ধ করে মালিক উধাও হয়ে যায়। এলাকার মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিক্ষোভে যোগ দেন। দোকানঘরের উপরের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও তীব্র প্রতিবাদ জানান। এম এস এস-এর কলকাতা জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি কর সূর্য সেনের মূর্তিতে মাল্যদানের পর রাজ্য সরকারের মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে ও সূর্য সেনের মূর্তির পাশে মদের দোকান বন্ধ করার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বিক্ষোভ সভায় ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস-এর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সূর্য সেন স্মৃতি সংঘের সম্পাদক সুব্রত বসু ও এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক কানু রায় বক্তব্য রাখেন।

মদের দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে এলাকার সাধারণ মানুষদের নিয়ে 'মাদক বিরোধী কমিটি' গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং দোকানের সামনে লাগাতার পিকেটিং চলছে।

হংক সম্মেলন

ভারত সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যোগ দিয়েছে

চারের পাতার পর

বহালমু থাকবে, এবং তার পরিমাণ রপ্তানি ভরতুকির চেয়ে প্রায় ৫০ গুণ বেশি। একটি হিসাবে দেখানো হয়েছে, ২০১৩ সালে রপ্তানি বাবদ যখন ১০০ কোটি ইউরো পরিমাণ ভরতুকি বন্ধ করা হবে, তখন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দিতে থাকবে ৫৫০০ কোটি ইউরো পরিমাণ ভর্তুকি। নামের মারপ্যাঁচ যাই হোক, এই ভর্তুকিও রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রেও কাজ করে এবং করবেও।

তুলোর ক্ষেত্রে আমেরিকা একই কায়দা করেছে, কিছুই ছাড়েনি। আফ্রিকার দেশগুলির মন্ত্রীরা দাবি করেছিলেন, আমেরিকা কমপক্ষে ৮০ শতাংশ ভরতুকি ২০০৬ সালের মধ্যে প্রত্যাহার করুক। ইতিপূর্বে আমেরিকা ভান করেছিল, তারা যেন সত্যিই এটা মেনে নিতে যাচ্ছে। কিন্তু হংকং বৈঠকের চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে শুধু বলা হয়েছে, ''তুলা উৎপাদনে দেওয়া ভরতুকি কমানো উচিত।'' এই ভরতুকি দেওয়া যে ঘোরতর অন্যায় ও অনুচিত, তা নিয়ে তো কোনও বিতর্ক ছিল না। এই অন্যায় ভরতুকি কমানো ও বন্ধ করার দাবিই ছিল মূল ইস্যু। সেখানে 'কমানো হবে' — এ'কথা না বলে 'উচিত' বলা হলে নীট ফল দাঁড়ায় শূন্য। ফলে আফ্রিকার তুলো উৎপাদনকারী দেশগুলো, তাদের অতীব প্রয়োজনীয় এই অনুরোধও আমেরিকাকে দিয়ে গ্রহণ করাতে পারেনি।

মাঝে মাঝেই আমরা সংবাদপত্রে দেখি, বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শাসকরা কোনও বৈঠকে মিলিত হয়ে, বিশ্বের 'ন্যূনতম উন্নত' (least developed) বা অনুন্নত দেশগুলির জনগণের দুর্দশার কথা ভেবে চোখের জল ফেলে, তাদের ঋণ মকুব করার কথা, খাদ্য সাহায্য দেওয়ার কথা প্রচার করে। এবার হংকং সম্মেলনেও এ'ধরনের বাগাড়ম্বরের অভাব ছিল না। বাস্তবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এইসব ন্যূনতম উন্নত দেশগুলির দাবি ছিল যে, তাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যগুলি যেন বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বাজারে প্রবেশ করে ব্যবসা করতে পারে ; আমদানি শুল্ক ও আমদানি কোটা বসিয়ে তাদের পণ্য প্রবেশে যেন বাধা দেওয়া না হয়। এই অনুরোধও রক্ষিত হয়নি। কোনও নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না দিয়ে শুধু বলা হয়েছে, 'বাজার পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে'। এ ধরনের সিদ্ধান্তে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না, সবটাই সাম্রাজ্যবাদীদের দয়ার উপর নির্ভর করে, যা নিয়ে কোনও আইনি অভিযোগও তোলা যায় না।

ন্যূনতম উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদিত বিশেষ বিশেষ পণ্য রপ্তানিতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সুবিধা দেবে — এমন একটা চুক্তিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানেও আসল জায়গায় বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এইভাবে পণ্যের বাজারে প্রবেশাধিকার দিতে যেসব দেশ অসুবিধায় পড়বে, তারা ৯৭ শতাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড় দেবে, ৩ শতাংশ আটকাতে পারবে। শতাংশের অঙ্ক দেখলে মনে হবে, বিরাট সুযোগ দেওয়া হল ; আসলে ওই ৩ শতাংশের মধ্যেই রয়েছে চালাকি। জাপানের প্রতিনিধি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেই দিয়েছেন, 'ন্যূনতম উন্নত দেশগুলির যেসব পণ্য আমাদের দেশের বাজারে ঢুকলে অসুবিধা, সেগুলো আটকে দিতে ওই ৩ শতাংশের ছাড়ই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট'। আমেরিকাও নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশ বা কাম্বোডিয়া থেকে বস্ত্র ও পোশাককে তারা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যের তালিকায় যুক্ত করবে না। আসল কথা দাঁড়াল, ন্যূনতম উন্নত দেশগুলো সেই সব পণ্যের বাজারেই ঢোকার সুযোগ পাবে, যেসব পণ্য তারা হয় উৎপাদন করে না, অথবা করলেও প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠবে না। এর থেকে বড় প্রতারণা আর কী হতে পারে !

নিবন্ধের শুরুতেই পরিষেবা ব্যবসায় বাজার খোলা নিয়ে 'প্লুরিল্যাটারাল' শব্দটি এনে একটা নতুন পদ্ধতি চালু করার কথা বলা হয়েছিল। 'মাল্টিল্যাটারাল' পদ্ধতি ছিল — কোনও দেশের গোটা পরিষেবা ক্ষেত্রকে ধরেই বাজার খোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত। তারপর কোন্ দেশ কোন্ পরিষেবা ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে ডাকবে বা বিদেশি কোম্পানিকে ব্যবসার সুযোগ দেবে, কোথায় কতটা পরিমাণ বাজার কীভাবে খুলবে, সে বিষয়ে সেই দেশ সিদ্ধান্ত নিতে পারত। পরিষেবা শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্র ধরে ধরে বাজার খোলার পদ্ধতি ও পরিমাণ নিয়ে কোনও আগাম নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ও তা কার্যকর করার বাধ্যতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ছিল না। এবার প্লুরিল্যাটারাল পদ্ধতিতে ঐ বাধ্যতা এনে দেওয়া হল। এর অর্থ দাঁড়াল, পরিষেবা শিল্প বিদেশি পুঁজির জন্য খোলার ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের পছন্দ-অপছন্দ, নিজস্ব প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বুঝে ক্ষেত্র নির্বাচন করতে পারবে না। পরিষেবা শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্র ধরে ধরে বাজার খোলার নির্দিষ্ট চুক্তিতে যেতে হবে। অর্থাৎ, পরিষেবা ক্ষেত্রের উদারীকরণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে উন্নয়নশীল দেশগুলি ইতিপূর্বে ঘোরতর আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু হংকং বৈঠকে এসে তারা আত্মসমর্পণ করল। এই ঘটনায় পরিষেবা ব্যবসায় নিযুক্ত আমেরিকা ও ইউরোপের মাল্টিন্যাশনালগুলো উল্লসিত। এরা যৌথভাবে 'The coalition of service industries' তৈরি করেছে এবং সম্মেলনের সময় হংকংয়ে থেকে আলোচনা ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিতও করেছে।

এছাড়া 'অ-কৃষিপণ্যের বাজার খোলা' (Non-agricultural market access বা NAMA) সংক্রান্ত আলোচনায়, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের শিল্পপণ্য যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজারে আরও ব্যাপক হারে প্রবেশ করতে পারে, তার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমদানি শুল্ক কমাবার যে ফর্মুলা মানিয়ে নিয়েছে, তাতে কার্যত কোন বাধাই আর থাকবে না। ফলে, দেখা যাচ্ছে, এই হংকং সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ লুটের জালকে 'উন্নয়নশীল' দেশগুলির অর্থনীতিতে আরও বিস্তৃত ও আঁটোসাঁটো করার পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে এবং এই নতুন চুক্তি যাতে অতি দ্রুত কার্যকর করা যায়, সেজন্য বলা হয়েছে, কৃষি ও অ-কৃষি পণ্যের বাণিজ্য উদার করা নিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার খুঁটিনাটি আলোচনা এপ্রিল মাসের মধ্যেই শেষ করে দিতে হবে, তারপরই সেগুলি কার্যকর করতে হবে। অনেকে বলছেন, এ সম্পর্কে জেনিভায় যে বৈঠক হওয়ার কথা, সেখানে আবার বিরোধ দেখা দেবে, উন্নয়নশীল দেশগুলো আবার আপত্তি তুলবে। একথা ঠিক যে, বিরোধ ঘটছে এবং আগামী দিনে এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ আরও বাড়বেই। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে 'উন্নয়নশীল' ও 'অনুন্নত' পুঁজিবাদী দেশগুলির বুর্জোয়া শাসকরা দৃঢ় অবস্থান নিয়ে লড়াই করতে পারবে — একথা আর বলা যায় না। এবার হংকং সম্মেলনে যেভাবে তারা শেষ মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চাপ ও কৌশলের কাছে আত্মসমর্পণ করল, তাতে এই প্রশ্ন না উঠে পারে না। হংকং সম্মেলনে এই দেশগুলির আত্মসমর্পণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, 'থার্ড ওয়ার্ল্ড রিসার্জেন্স' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক মার্টিন খর লিখেছেন, ''সম্মেলনের শেষ দিন উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিটি জোটই —জি-২০, জি-৩৩, তুলা উৎপাদনকারী ও ন্যূনতম উন্নত দেশগুলি প্রভৃতি — গভীর বিশ্বাসে ধরে নেয় যে, তারা ইতিমধ্যেই যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে, তা এতই যথেষ্ট যে, পরিষেবা ও অ-কৃষিপণ্যের বাজার উদারীকরণের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করার আর দরকার নেই।'' মার্টিন খরের ভাষায় ''উন্নয়নশীল দেশগুলির নানা গ্রুপকে অন্যরা বোঝায় (অথবা তারা নিজেরাই নিজেদের বোঝায়) যে, সমগ্র বিলিব্যবস্থাটা (whole package) যা করা হল, সেটা মেনে নিলে, তাদের স্বার্থ সিদ্ধ হবে।'' ওঁর অভিমত মেনে নিলে উন্নয়নশীল দেশগুলির বুর্জোয়া শাসকদের নিতান্তই সরল ও অজ্ঞ বলে ধরে নিতে হয়। আসলে সব দেশগুলোই পুঁজিবাদী দেশ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চাপের মুখে এদের পক্ষে দাঁড়ানো কঠিন একথা যেমন ঠিক, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে, আজ আর এরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রামী ভূমিকা নিতে পারে না। কখনও লড়াকু ভাব নেয়, আবার পরমুহূর্তেই চাপ ও লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই অবস্থাতেও কিছুটা লড়াই এরা করতে পারত, যদি ভারত, চীন ও ব্রাজিলের মতো শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশগুলো এদের পাশে দাঁড়াত, যেটা অতীতে একদা ভারত করত। কিন্তু এবার হংকং সম্মেলন দেখাল যে, প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ও তার শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি পার্টনারের ভূমিকায় নেমেছে ভারত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পার্টনারশিপের ছবিটা ইতিমধ্যে নানা ঘটনায় উন্মোচিত হচ্ছে, তার সঙ্গে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থ যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটা হংকং সম্মেলন পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। যেজন্য ভারতের সকল বণিকসভা ও একচেটিয়া পুঁজিপতিরা হংকং বৈঠকে ভারত সরকারের ভূমিকায় আনন্দ প্রকাশ করেছে। অ-কৃষিপণ্যে আমদানি শুল্ক কমাবার সিদ্ধান্তেও তারা ক্ষুব্ধ নয়। কারণ, পরিষেবা ব্যবসার বাজার খোলার যে বিলিব্যবস্থাটা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অন্যান্য উন্নয়নশীল ও গরিব দেশগুলোকে দিয়ে ভারত মানিয়ে নিয়েছে, তার ফলে ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিদের সামনেও পরিষেবার ঝুলি নিয়ে এইসব দেশের বাজারে ঢুকে মুনাফা লুটবার রাস্তা আরও খুলে গেছে। এতে ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিরা উল্লসিত। কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়েছে আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইম্‌স পত্রিকার প্রতিবেদনেও ; ১৯ ডিসেম্বরের সংখ্যায় লেখা হয়েছে —''টেলিযোগাযোগ, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি পরিষেবা ক্ষেত্রে মুক্তবাণিজ্য চালু করার আলোচনায়, গরিব দেশগুলিকে দিয়ে এগুলি মানিয়ে নেওয়ার কাজে ভারত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে''।

ভারতীয় একচেটে পুঁজির স্বার্থেই একদা ভারতের বুর্জোয়া শাসকরা বিশ্বে শান্তি, সুস্থিতি, উন্নয়ন, বৈষম্যহীনতার বাণী দিয়ে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধতা করে উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে গ্রহণীয় যে 'উদার ভাবমূর্তি' তৈরি করেছিল, আজ সেটাকেই কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস শাসকরা ওইসব দেশে ভারতের নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজির প্রবেশ ও লুটের রাস্তা করে নিচ্ছে। আমেরিকা-ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা যেমন বিশ্বজোড়া তাদের শোষণ-লুঠকে 'জাতীয় স্বার্থ' বলে নিজ নিজ দেশের মানুষকে বোঝায়, ভারতের শাসকরাও তেমনই এখন ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির অন্য দেশের বাজারে লুটের সুযোগ পাওয়াকে 'জাতীয় স্বার্থ' বলে দেখাচ্ছে। ভারতে উৎপাদিত পণ্য ও ভারতীয় পরিষেবা ব্যবসা বিদেশের বাজারে বেশি বেশি ঢুকলেই যদি ভারতীয় জনগণের কল্যাণ হত, তবে ভারতীয় কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি সত্ত্বেও কেন ভারতের কৃষকদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে ? কেন দলে দলে চাষীরা ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করছে ? কেন কোটি কোটি মানুষ অনাহারে থাকছে ? কেন পরিষেবা ক্ষেত্রে ছাঁটাই হচ্ছে ? কেন বেকাররা কাজ পাচ্ছে না ?

হংকং সম্মেলনে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে সি পি এম-সি পি আইও কিছু সমালোচনা করেছে, যার মধ্য দিয়ে তাদের দ্বিচারিতাই আবার স্পষ্ট হয়েছে। এই দুটি দল যে রাজ্যে সরকারে আছে, সেখানে নিজেরা বিশ্বায়নের পক্ষে ওকালতি করছে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দ্বারা উন্নয়নের স্বপ্ন ফিরি করছে, আবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বায়নমুখী

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড ইতি বোসের জীবনাবসান

দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর দুরারোগ্য ক্যান্সারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রামের পর কমরেড ইতি বোস গত ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭২ সালে কলকাতা বিহারীলাল কলেজে পড়ার সময়ে তিনি ডি এস ও'র কাজ শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে রাজভবনের সামনে পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হন। বাবা ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেখানকার পার্টি ইউনিটের সাথে যুক্ত হন। কিন্তু বাড়ির খারাপ আর্থিক অবস্থা ও বিয়ে না করার মনোভাব থেকে চাকুরিজীবন শুরু করার পর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে থাকতে পারেননি। ২০০০ সালে তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে। ওই বৎসরই দলের সল্টলেক কমিউনের সামনে অবস্থিত আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে চলে আসার পর দলের সাথে তাঁর সম্পর্ক আবার ঘনিষ্ঠ হয়। মাঝে মাঝে সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর সাথে তিনি দেখা করতে কমিউনে আসতেন। পার্টির বইপত্র, শিবদাস ঘোষের রচনাবলী আগ্রহের সাথে পড়তে থাকেন, গণদাবীর গ্রাহক হন, পার্টি কোটা দেওয়া শুরু করেন। ২৪ এপ্রিল ও ৫ আগস্ট অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও কমিউনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। রোগজীর্ণ শরীরে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পার্টির সাথে তাঁর পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন তাঁর জীবনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। হাসপাতালে শেষবার ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর সদা প্রাণবন্ত ভাব চিকিৎসক ও অন্যান্য সকলকেই বিস্মিত করত।

কমরেড ইতি বোসের মরদেহ তাঁর আবাসনের সামনে নিয়ে এলে আবাসনের বহু মানুষ সমবেত হন ; ফুল ও মালা দিয়ে অনেকেই শ্রদ্ধা জানান। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত মরদেহে মাল্যার্পণ করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড ইতি বোস লাল সেলাম

কলিঙ্গনগর ঃ বঞ্চিত আদিবাসীরা লড়াইয়ের ময়দানে

বিশ্বব্যাপী মানুষ যখন ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করছিল, তখন ২ জানুয়ারি ওড়িশার কলিঙ্গনগরের আদিবাসী জনসাধারণ সম্ভবত তাদের জীবনের রক্তাক্ততম দিন প্রত্যক্ষ করল; সংবাদমাধ্যমে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল ওড়িশার বিজেডি-বিজেপি সরকারের পুলিশের বর্বরতার নিদর্শন — ১৩ বছরের এক স্কুল ছাত্র ও তিন মহিলা সহ মোট ১২ জনের হত্যা। মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমোঘ নিয়মে দেশের চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত আপামর সাধারণ মানুষ শোষিত-বঞ্চিত হচ্ছে — একথা ঠিক, কিন্তু আদিবাসী জনগণের প্রতি শোষণ-বঞ্চনা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও তীব্রতম। সুদীর্ঘকালের বঞ্চনায় প্রতারণায় জর্জরিত কলিঙ্গনগরের আদিবাসী জনসাধারণ। তাদের বুকের ভিতরে ক্ষোভের বারুদ জমতে জমতে যে বিস্ফোরণের চেহারা নিয়েছিল, তাকে নৃশংসভাবে দমন করে তাদের মনোবল ধসিয়ে দেওয়াই ছিল সরকারের লক্ষ্য। কিন্তু এত রক্ত, এত প্রাণ বলি দিয়েও ওরা মরিয়া। আজও তারা সরকার ও বেসরকারি মালিকশ্রেণীর যৌথ লুণ্ঠন-আক্রমণের বিরুদ্ধে অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে — যা সত্যিই শিক্ষণীয়।

শিল্পায়নের নামে তাদের ভিটে ও জমি থেকে উচ্ছেদ করে ক্রমে ক্রমে সরকার দখল নিয়েছে ১২ হাজার একর (৩৬ হাজার বিঘা) জমি। সেজন্য একর পিছু তারা জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়েছে তিন দফায় মোট ৭৭ হাজার টাকা। কিন্তু সরকার সেই জমি বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছে একর পিছু তিন লক্ষ টাকা দরে। ঠিক যেমন আমাদের পশ্চিমবাংলায় সিপিএম সরকার নিজেই জমি নিয়ে ফাটকা ব্যবসায় নেমেছে। এখানে তারা চাষীকে কাঠা পিছু ১০ হাজার টাকায় জমি বেচতে বাধ্য করছে এবং সেই জমি কিনে নিয়ে সরকার সালিম গোষ্ঠীকে বিক্রি করছে কাঠাপ্রতি তিন লক্ষ টাকা দরে।

জমিহারাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নেও এ রাজ্যের সিপিএম সরকারের মত ওড়িশার বিজেডি-বিজেপি সরকার বাস্তু ও জমিহারা আদিবাসী জনসাধারণকে ক্রমাগত প্রতারিত করছে। এক দশকেরও আগে জমিচ্যুত মানুষগুলো আজও পুনর্বাসনের অপেক্ষায় দিন গুণছে। নীলাচল ইস্পাত নিগম লিমিটেড জমিহারাদের জন্য যে পুনর্বাসন কলোনি গড়ে দিয়েছে সেখানে না আছে চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ তথা হাসপাতাল, না আছে কবরস্থান, এমনকী আদিবাসী জনসাধারণ পুজো করবার স্থানটুকুও সেখানে পায় না। পরিবার পিছু একজনকে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইস্পাত নিগম, তাও তারা রাখেনি। ১১১টি উচ্ছেদ হওয়া পরিবারের মধ্যে মাত্র ২০ জনকে তারা কাজ দিয়েছে। পুনর্বাসন না পেয়ে জমিহারা শত শত পরিবার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, বৃদ্ধ বাবা-মা নিয়ে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় পরিবারগুলি পথে পথে ঘুরছে, এখানে ওখানে ঠাঁই পাতছে, আবার পুলিসের তাড়া খেয়ে সেখান থেকে উঠে যাচ্ছে। দীর্ঘকালব্যাপী সরকারের তীব্র বঞ্চনা ও প্রতারণার শিকার তারা। তাই বারে বারে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছে — যা একান্তই স্বাভাবিক। বারে বারেই তারা সরকারের কাছে উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবি উত্থাপন করে আর্জি জানিয়েছে — জমিহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সরকার যেন কোন কোম্পানিকে জমিতে নির্মাণকার্য শুরু করার অনুমতি না দেয়। বিজেডি-বিজেপি সরকার এই আর্জিতে কর্ণপাতই করেনি। তারা বরং বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে মউ (MOU) স্বাক্ষর করে চলেছে এবং তাদের শিল্পস্থাপনে যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ওড়িশা সরকার ৪৩টি মউ স্বাক্ষর করেছে।

১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকেই সরকার এই জমি দখল করে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির হাতে তুলে দেবার তথাকথিত শিল্পায়ন শুরু করেছে। উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবিতে বহুবার মানুষ প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ইত্যাদি প্রদর্শন করেছে। গত ৯ মে তাদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে ২৫ জন মহিলা, ১৪ জন শিশু ও ২৬ জন পুরুষকে গ্রেপ্তার করে ২২ দিন তাদের জেলে আটকে রাখে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও সরকারের এই ভূমিকার নিন্দা করেছে। গত ২৬ নভেম্বর জমিহারা মানুষেরা স্থানীয় থানা অবরোধ করে বসেছিল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছিল যে, উপযুক্ত পুনর্বাসনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করলে এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ আরও বাড়বে। কিন্তু গায়ের জোর, থানা-পুলিশের বর্বরতা ও ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ সরকার কোন আর্জি, কোন দাবি, কোন হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দেয়নি।

এরপর, অন্যান্য গোষ্ঠীর মত টাটা কোম্পানিও সেখানে জমির দখল নিতে যায় এবং দখলীকৃত এলাকাটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলতে শুরু করে। প্রতিবাদে ২ জানুয়ারি জমিচ্যুত আদিবাসী জনসাধারণ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। দাবি তুলেছিল — আগে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কর, তারপর জমিতে হাত দেবে। সরকার ও তাদের প্রশাসন এই মানুষদের সঙ্গে আলোচনার কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি তাই নয়, তাদের উপর লেলিয়ে দিয়েছে পুলিশ।

প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে অবিরাম লাঠি, টিয়ারগ্যাস, রবারবুলেট ও গুলি বর্ষণ করে তারা ১২ জনকে হত্যা করে। আহত অসংখ্য।

সরকার তড়িঘড়ি নিহতদের পরিবারবর্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ঘোষণা করেছে, হাইকোর্টের এক কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে হত্যাকাণ্ডের বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও সরকার জারি করেছে, জাজপুর কালেক্টর ও পুলিশ সুপারকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে। এগুলির কোনটাই করতে হত না, যদি সরকার এই অসহায় পরিবারগুলির উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আগেই করে দিত। সরকার এখন পুনর্বাসনের বিষয়টি দ্রুত বিবেচনার জন্য কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেছে। কী চমৎকার গণতন্ত্র! যে সরকার ভিটেমাটি কেড়ে নিয়ে মানুষকে উদ্বাস্তু বানিয়েছে, সেই সরকারকে পুনর্বাসনের দাবি মানাতে বলি দিতে হল বারটি তাজা প্রাণ।

ওড়িশার বিরোধী দল কংগ্রেস ও তার সর্বভারতীয় নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ছুটে গিয়েছিলেন কলিঙ্গনগরে। নিহত আহত আদিবাসীদের জন্য তিনি চোখের জল ঝরালেন এবং জমিচ্যুতদের কেন পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি তার অভিযোগ তুলে রাজ্যের বিজেডি-বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে এলেন। অথচ নিজেরা কী করেছেন এবং করছেন সারা দেশ জুড়ে, রাজ্যে রাজ্যে? জরুরি অবস্থার সময় সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে দিল্লির তুর্কমান গেটের কাছে বস্তি বুলডোজার দিয়ে রাতের অন্ধকারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার কাহিনী আমরা আজও ভুলিনি। এছাড়া রাজ্যে রাজ্যে যেখানেই তারা ক্ষমতাসীন, সেখানেই তারা ভিটেমাটি থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করে সেই সব জমি তুলে দিচ্ছেন নানান বেসরকারি কোম্পানির হাতে। অন্ধ্রপ্রদেশে দলীয় সদর দপ্তর তৈরির জন্য ভীমওয়াড়া পল্লীর ১০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করতে সদ্য তাঁরা নোটিশ জারি করেছেন; গত ২১ জানুয়ারি সোনিয়া গান্ধী স্বয়ং সেখানে শিল্যান্যাস করে এলেন।

সিপিএম-ও ওড়িশার বিজেডি-বিজেপি সরকারের নিন্দায় মুখর, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেখানে তারা ২৮ বছর ক্ষমতাসীন সেখানে রাজারহাট, বানতলা, বক্রেশ্বর প্রভৃতি এলাকায় হাজার হাজার পরিবারকে জমিচ্যুত ও বাস্তুচ্যুত করেছেন কোনরকম পুনর্বাসন ছাড়াই। এই পরিবারগুলি ভিখারি হয়ে পথে পথে ঘুরছে। তাদেরই রাজ্যে শ'য়ে শ'য়ে আদিবাসী পরিবারের জমি লুঠ হয়ে যাচ্ছে; লুঠেরাদের মধ্যে সিপিএম কর্মীরাও আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং, গোসাবা, সন্দেশখালি এলাকায় বছরের পর বছর ধরে চলছে এই অপকর্ম। পুলিশ দেখেও না দেখার ভান করছে। সরকার নীরব। আর কলিঙ্গনগরের আদিবাসীদের জন্য তারা চোখের জল ফেলছে।

এরা সব ভণ্ড, প্রতারক, ভোট-রাজনীতির পাকা খেলোয়াড়। ক্ষমতায় বসে এরা মালিকশ্রেণীর দাসানুদাস, তার আগে জনস্বার্থ রক্ষার ভেকধারী। ক্ষমতায় বসলে এরা চাষী ও আদিবাসীদের জমিচ্যুত করে মালিক-পুঁজিপতিদের জমি পাইয়ে দেয়; আর যেখানে ক্ষমতায় নেই সেখানে উচ্ছেদের বিরোধিতা করে জনসাধারণের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগায় এবং তা ভোট বাক্সে ঢোকায়, রাজা উজির হয়। পুঁজিবাদের যারা দালাল — এটাই তাদের চরিত্র। উন্নয়ন নয়, শিল্পায়ন নয়, পুঁজিপতিদের হাতে জমি তুলে দেওয়া এবং মালিকশ্রেণীর মুনাফা লুণ্ঠনকে ক্রমাগত বাড়তে সাহায্য করা — এটাই তাদের প্রধান কর্মসূচি এবং এর সঙ্গে বাড়তি সুযোগ হিসেবে জমির ফাটকা ব্যবসায় কিছু কামিয়ে নেওয়া।

রাজ্যে রাজ্যে শাসক দল ও তথাকথিত বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা লক্ষ করলে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ অত্যন্ত পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ। ফলে তামাম শোষিত মানুষ — তারা যে রাজ্যের ও যে পেশার মানুষ হোক না কেন — মালিকশ্রেণীর শোষণ-বঞ্চণা-প্রতারণার বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে যদি সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে না তোলে তবে রেহাই নেই।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালন

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লিট্‌ল আন্দামানে ২৩ জানুয়ারি নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে। রামকৃষ্ণপুরে সকাল ৭টায় নেতাজীর ছবিতে মাল্যদান করেন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি ও শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল ও সম্পাদক মোহন মিস্ত্রি। এছাড়া এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাল্যদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। ব্যাজ পরিধান ও নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডলের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর প্রবীণদের দুই কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্যানুষ্ঠান হয়। নেতাজীর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন প্রাক্তন শিক্ষক সুব্রত রায়, সারা বাংলা নেতাজী জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষে গোপাল সাহু এবং সভার সভাপতি ও এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক পি কে মণ্ডল।

বিদেশ থেকে দেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পথে নেতাজী এই দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন করে নাম দিয়েছিলেন শহীদ-স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপেই রয়েছে শহীদদের স্মৃতি-বিজড়িত, সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের প্রতীক সেলুলার জেল। সেই দ্বীপপুঞ্জেরই অংশ লিট্‌ল আন্দামানে সর্বপ্রথম এই নেতাজী স্মরণ অনুষ্ঠান তাই এলাকার মানুষ, বিশেষত প্রবীণদের মনে গভীর দাগ কেটেছে।

হংকং সম্মেলন

ছয়ের পাতার পর

নীতি ও ভূমিকার সমালোচনা করছে। আবার, একই সাথে সেই সরকারকেই সমর্থন দিয়ে টিকিয়েও রাখছে। এটা কি দ্বিচারিতা নয় ?

হংকং সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনও দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী ও শাসকরাই আজ আর লড়তে পারে না, এদের উপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠবে না। লক্ষণীয় যে, আজ লাতিন আমেরিকার সেইসব দেশই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুটের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে, যেসব দেশে ব্যাপক জনগণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সামিল হচ্ছে, যথার্থ গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, জনসাধারণের জঙ্গি আন্দোলন ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করার অন্য কোনও পথ নেই।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ও গণতন্ত্র

মিথ্যাকে গলার জোরে সত্য করা যায় না

গত ৯ ফেব্রুয়ারি সকালে সংবাদপত্রের পাতায় চোখ পড়তেই স্পষ্ট হয়ে উঠল খোদ রাজধানী কলকাতার আইনশৃঙ্খলার মর্মান্তিক চিত্র। আগের রাতে আইনশৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা এক পুলিশ সার্জেন্ট লিফ্‌ট নেওয়ার অছিলায় বিয়েবাড়ি ফেরত এক দম্পতির গাড়ি থামিয়ে যেভাবে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মহিলার শ্লীলতাহানি করল — তাতে আইনশৃঙ্খলার 'মরূদ্যান' কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলার নগ্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। শুধু সার্জেন্ট নয়, চার অধস্তন পুলিশকর্মীও তাদের 'স্যার'কে এই অপকর্মে যথাযোগ্য সহায়তা দিয়েছে। তারা একদিকে টানাহ্যাচড়া করে মহিলাকে স্বামীর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, অন্যদিকে মহিলার স্বামীকে জোর করে পুলিশ ভ্যানে উঠতে বাধ্য করে যাতে সার্জেন্ট বিনা বাধায় নিজের লালসা চরিচার্থ করতে পারে। বাঙ্গালোর প্রবাসী দম্পতির ধারণাই ছিল না যে, কলকাতায় মেয়েদের সম্ভ্রম এমনভাবে লুণ্ঠিত হয়, তাও আবার আইনের রক্ষকদের হাতে। তাঁরা বোধহয় ভাবতেই পারেননি যে, একটু রাত হয়ে গেলে পুলিশই এখানে নারীর সম্ভ্রমহানি করবে।

অথচ বুদ্ধদেববাবুদের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই জঘন্য অপরাধী সার্জেন্টের বিরুদ্ধে কোন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাকে কেবলমাত্র সাসপেন্ড করা হয়েছে। ক'দিন পরেই অন্য খবরের আড়ালে চলে যাবে পুলিশ সার্জেন্টের এই জঘন্য অপরাধের কথা। সাসপেনশনের সময়সীমা পার হলেই সার্জেন্ট আবার কাজে যোগ দেবে, কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে অন্যত্র বদলি নেবে এবং শেষমেশ পূর্ণশক্তি নিয়ে পুনরায় ফিরে আসবে। ঠিক যেমনটি গত প্রায় ত্রিশ বছরের শাসনে হয়ে আসছে।

সংবাদপত্র খুললে প্রতিদিনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আইনশৃঙ্খলার এমনই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। এমন কোন দিন নেই যেদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও খুন, ধর্ষণ, অপহরণ ঘটছে না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই তো প্রাত্যহিক ঘটনা। এবং বহুক্ষেত্রে থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রীতিমত বোমাবাজি করে ডাকাতি হচ্ছে, খুন হচ্ছে। ফোন করে ডাকাতির খবর জানালেও পুলিশ সাড়া দেয় না; ডাকাত ও খুনিরা কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার এক ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা বাদে পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছায়। পৌঁছেই হম্বিতম্বি করে বীরত্ব জাহির করে। ঠিক সময়ে আসতে না পারার পক্ষে যুক্তি দেয়, গাড়িতে পেট্রোল ছিল না, কিংবা স্টাফ সমস্যা, নয়তো গাড়ি অন্যত্র গিয়েছিল। এই হচ্ছে বুদ্ধদেববাবুর এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি!

মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলে থাকেন, আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ 'মরূদ্যান'। সেই 'মরূদ্যান' নারীপাচারে এখন ভারত সেরা। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগণা, উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলি সহ হাওড়া, হুগলি, এমনকী খোদ রাজধানী কলকাতা থেকেও মেয়েরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র যাদবপুর থেকেও মেয়েরা পাচার হচ্ছে। পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব। অথচ পুলিশ সবই জানে। তাদের যোগসাজশ না থাকলে দিনের পর দিন ব্যাপক আকারে এ জিনিস চলতেই পারতনা। একমাত্র কোন ক্ষেত্রে বিক্ষোভ-আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে তবেই পুলিশ-প্রশাসন খানিকটা নড়েচড়ে বসে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও বলছে, 'পশ্চিমবঙ্গ নারী পাচারচক্রের বড় কেন্দ্র', আরও বলেছে, 'নারীপাচারকারীদের সঙ্গে পুলিশের একাংশের যোগসাজসেই পাচার চলে।' কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন গিরিজা ব্যাস বলেছেন, 'এ রাজ্যটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নারীপাচার, নারী চালান এবং নারী নির্যাতনের রাজ্য। আন্তর্জাতিক নারী পাচারচক্র পশ্চিমবঙ্গকে ব্যবহার করছে ট্রানজিট (যাত্রাপথ) এবং ডেস্টিনেশন (গন্তব্য) হিসেবে।'

প্রতি বছর রাজ্যের নাবালক, নাবালিকা, পুরুষ ও মহিলা মিলে হাজার হাজারে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার গড়িয়াহাট থানা এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার তথা আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের নেতাদের অতি ঘনিষ্ঠ মনীষা মুখোপাধ্যায়। খুব হৈ চৈ হয়। আজও তাঁর হদিস মেলেনি। কিন্তু যাঁরা মনীষাদেবীর মত গুরুত্বপূর্ণ নন তেমন হাজার হাজার নিখোঁজদের নিয়ে কোনও হৈ চৈ হয় না। খোদ কলকাতা পুলিশের তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, শুধু কলকাতা থেকেই প্রতি বছর নিখোঁজ হচ্ছে তিন হাজারেরও বেশি। এরাজ্যে ২০০২ সালে ৩৬২৮ জন, ২০০৩ সালে ৩৪৩৯ জন, ২০০৪ সালে ৪০৫৭ জন এবং ২০০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৩০৪১ জন নিখোঁজ হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরই বলছে, নির্যাতন করে বধূহত্যা ও বধূর আত্মহত্যা রাজ্যে কী বহাল তবিয়তেই না চলছে! গত ৬ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, কোনও বছর এই মাত্রা সামান্য কিছু কমলেও, পরের বছর তা আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংখ্যা ২০০০ সালে ১৩৬৯টি, ২০০১ সালে ১৩০৩টি, ২০০২ সালে ১৩৭৫টি, ২০০৩ সালে ১২৬৬টি, ২০০৪ সালে ১৫২৮টি, ২০০৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত ১১০৮টি।

সিপিএম নেতৃত্ব দাবি করেন, এ রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ তাঁদের সঙ্গে রয়েছে। বহু জায়গায় তাঁরা ৯০ শতাংশেরও বেশি ভোট পান। তাঁদের নেটওয়ার্ক নাকি রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি পাড়ায় ও মহল্লায় তাঁদের পার্টি নজর রাখে। তা সত্ত্বেও নারীপাচার, শিশুপাচার, নিখোঁজ, অপহরণ, বধূ নির্যাতন ও হত্যা ইত্যাদি এত বাড়ছে কেন? এমন সর্বশক্তিমান পার্টি সামান্য আগ্রহী হলেই তো রাজ্য থেকে এইসব পাপ দূর হতে পারে।

আসলে, পুলিশ-প্রশাসন সহ এই পার্টিটির সর্বাঙ্গে পচন ধরে গিয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু সেই পুলিশ শাসকদলের আজ্ঞাবহে পরিণত। শাসকদলকে চটিয়ে নিরপেক্ষ কাজ করবার সৎ সাহস খুব কম পুলিশ অফিসারেরই আছে। দূর-দুর্গম এলাকায় ট্রান্সফার হওয়া এবং ঝক্কি-ঝামেলায় জড়িয়ে যাবার ভয়ে অনেকেই শাসকদলের নেতাদের হুকুম তামিল করে চলেন। আবার অনেকে ভাল প্রমোশন, প্রচুর অর্থাগমের মতো শাঁসালো জায়গায় ট্রান্সফার এবং নানা অপকর্মের ছাড়পত্র পেতে নেতাদের তোয়াজ করে চলেন। শাসকদল পুলিশকে কী নিকৃষ্টভাবে কাজে লাগায়, পুলিশ অফিসার নজরুল ইসলামের লেখা 'পুলিশ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে সেসব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। অন্যদিকে ক্রিমিনালরা নাম লিখিয়েছে শাসকদলের খাতায়। এরা ভোটের সময় শাসকদলের পক্ষে ভোট করায়; নেতাদের নির্দেশে এরা বিরোধী দলের, বিশেষ করে গণআন্দোলনের বিপ্লবী নেতা-কর্মীদের খুন করে। এইভাবে তারা সিপিএম নেতৃত্বের নির্দেশে রাজ্যে 'গণতন্ত্র' রক্ষা করে। বিনিময়ে নিজেরা ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, অপহরণ সহ যা খুশি করবার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। ফলে, কে এদের ধরবে? কার সে হিম্মত আছে? পুলিশ, ক্রিমিনালবাহিনী ও শাসকদলের সম্মিলিত চক্র তো বহুকাল ধরেই রাজ্যে বিরাজ করছে। থানায় বসে থানা অফিসার ও ক্রিমিনালদের নিয়ে একত্রে মিটিং করে বিরোধী নেতা-কর্মীদের খুনের ব্যবস্থা পাকা করা হয়, ভোট-মেশিনারি সাজানো হয়। বহু খুন ও ধর্ষণের যে আসামীরা ফেরার, পুলিশ যাদের খুঁজে পাচ্ছে না বলে খাতায় লিখে রাখে, সেই ক্রিমিনালদের সঙ্গে একত্রে বসে পুলিশ-অফিসারেরা মদ-মাংস খায়, স্ফূর্তি করে। পুলিশ নিজেরাই রাস্তা থেকে, বস্তি থেকে মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে ব্যারাকে ধর্ষণ করে, লকআপে যাকে খুশি পিটিয়ে হত্যা করে, মিথ্যা মামলায় সৎ মানুষদের — গণআন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ফাঁসিয়ে জেলে পোরে।

পশ্চিমবঙ্গে জেল ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু

	জেলে মৃত্যু	পুলিশ হাজতে মৃত্যু	মোট মৃত্যু
১৯৯৫-৯৬	১৪	৩৭	৫১
১৯৯৬-৯৭	৪৭	১৬	৬৩
১৯৯৭-৯৮	৪৬	১৭	৬৩
১৯৯৮-৯৯	৩৬	১৫	৫১
৯৯-২০০০	৪৫	৩৯	৮৪
২০০০-০১	৪১	২১	৬২
২০০১-০২	৫৫	২২	৭৭
২০০২-০৩	৫৩	১৬	৬৯
২০০৩-০৪	৪৪	৯	৫৩

(এপ্রিল - অক্টোবর)
জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট

খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ থেকেই দেখা যাচ্ছে, ক্রিমিনাল চক্রের ফাঁক-ফোকর দিয়ে এখন খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি অপকর্মে জড়িত থাকার জন্য যারা ধরা পড়ছে তাদের অধিকাংশেরই পরিচয় — তারা শাসকদল সিপিএমেরই নেতা-কর্মী। দমদমের দোর্দন্ডপ্রতাপশালী নেতা দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বউবাজারের বুকি রসিদ খান, দলগাঁও চা-বাগানের মাফিয়া ডন তারকেশ্বর লোহার, হাতকাটা দিলীপ, বুল্টন, পিনাকী — এমনি কত সব নাম। এরা যে ধরা পড়েছে — তার কোনটাই শাসকদল ও পুলিশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নমুনা হিসেবে নয়। পার্টির ভিতরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে না উঠলে এদের জুলুম অব্যাহতই থাকত; এরা পার্টির 'সম্পদ' বলে গণ্য হত। সারা পশ্চিমবঙ্গে তাদের এমন সব 'সম্পদ' বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে চলেছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের তৎপরতায় উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় কয়েকজন সিপিএম নেতা ধরা পড়েছে নির্বাচন কমিশনের জাল করা হলোগ্রাম, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র ও রেশনকার্ডের জালিয়াতির অভিযোগে। এক একটি পরিবার পিছু ভোটের পরিচয়পত্র ও রেশনকার্ড করে দেবার জন্য তারা ২৪ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছে। গত প্রায় ৩০ বছর সিপিএম সরকারের শাসনের এই হল পরিণাম। শাসকদলের নেতা-কর্মীরা যে রাজ্যে ক্রিমিনাল ক্রিয়াকলাপের নায়কে পরিণত এবং যেখানে পুলিশ শাসক পার্টির দাসানুদাস, সেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কেমন — তা বুঝতে কি কোন অসুবিধা হয়?

আর গণতন্ত্র! পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র আছে বটে, তবে তা সিপিএম পার্টির গণতন্ত্র। 'সিপিএম জিন্দাবাদ' বললেই এখানে যে কোন অপরাধ, যা কিছু করার ছাড়পত্র পাওয়া যায়। আর সিপিএম-এর বিরোধিতা করলে বা সমালোচনা করলে, অন্য রাজনীতিকে সমর্থন করলে, বিশেষত গণআন্দোলনের নেতা-কর্মী হলে তো কথাই নেই, পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হবে, ঘরবাড়ি লুঠ করা হবে, এলাকাছাড়া করা হবে, মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম লুট করা হবে, হত্যা করা হবে, মিথ্যা অভিযোগে জেলে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালানো হবে, প্রয়োজনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ানো হবে। আর, সিপিএমের পক্ষে ভোট দেবে না মনে হলে, এমনকী সিপিএম জিন্দাবাদ বললেও যদি তাঁরা সন্দেহভাজন হয় তবে তাঁদের ভোট দেবার পরিশ্রমটুকুও করতে হয় না। গণতন্ত্রী বাহিনীই(!) তাদের ভোটটা দিয়ে দেয়।

এবার নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছে, তাঁরা মানুষকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্য বলছেন। কিন্তু তারপর? তারপর সিপিএমের ঠ্যাঙাড়ে ও ঘাতক বাহিনীর আক্রমণ ও বয়কটের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে কে রক্ষা করবে? জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিরোধের পরিণতি কী হয় — তা মানুষ তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সম্প্রতি সিপিএম নেতা বিমান বোস পার্টির কর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, বিরোধী দলগুলি ভোটের মুখে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার ও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এদের মোকাবিলায় এলাকায় এলাকায় প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তুলতে হবে — যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা এলাকায় ঢুকতে না পারে। এই নির্দেশের মর্মার্থ কী, কেমন গণতন্ত্র রক্ষা — রাজ্যবাসী মাত্রেই তা বুঝতে পারছেন। সিপিএম নেতারা তাই বলে বেড়াচ্ছেন, পর্যবেক্ষকরা যাই বলুক আর করুক, নির্বাচনে তাঁরা জিতছেনই।

কলকাতায় ঘটে যাওয়া প্রধান প্রধান অপরাধের পরিসংখ্যান

	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪
খুন ঃ	৪৯	৬৬	৫৮	৫৪	৩৭
ডাকাতি ঃ	২৬	২৭	১৮	৩৩	১৯
রবারি ঃ	১৫২	১৫০	১৬৭	১৭৩	১১৬
চুরি ঃ	১১০	১৪৭	১৮৫	১৩৪	১৩৯
শ্লীলতাহানি ঃ	১৫২	১৬৫	১৬০	১৮৫	১৭৪
মোটর বাইক ও গাড়ি চুরি ঃ	১০৩৪	১১৬২	১০৮১	৯২৯	৭৬৪

প্রতিদিন ১৯-১-০৫

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তথা জর্জ বুশ যেমন বিশ্বে গণতন্ত্র রক্ষার গার্জেন, তেমনি এ রাজ্যে গণতন্ত্রের গার্জেন সিপিএম নেতৃত্ব। তাঁদের হুকুমই গণতন্ত্র। তাঁদেরই ট্রেনিংপ্রাপ্ত এস এফ আই করা এক কলেজ ছাত্র তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারে, কলেজে গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব তাদের হাতে; তাই অন্য ছাত্র সংগঠনকে তারা কলেজে ঢুকতে দেয় না, পাছে তারা এসে গণতন্ত্র নষ্ট করে ফেলে। আইনশৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রের মরূদ্যান পশ্চিমবঙ্গের এই হচ্ছে বাস্তব চেহারা। অথচ রাজ্যবাসীর উদ্দেশে সিপিএম নেতৃত্ব আহ্বান জানিয়েছেন, 'রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও গণতন্ত্র সুরক্ষিত রাখতে' আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ফ্রন্টকে ভোট দিন (গণশক্তি ২১-১২-০৫)। তাঁরা বোধ হয় ভেবেছেন, সত্য আড়াল করতে মিথ্যে বার বার বল, জোরে জোরে বল, সমস্বরে বল, ঢাকঢোল পিটিয়ে বল, মানুষ প্রচারের জোরে মিথ্যেটাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করবে। কিন্তু মানুষের বেদনাদায়ক যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সেটা তাঁরা কেমন করে ভোলাবেন?

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in